(পরিমাণ ১ ছটাক) অর্দ্ধসের পরিমিত টাট্‌কা সর্ষের তেলে ভাজিয়া ছাঁকিয়া লইয়া থল্লীস্থলে মালিশ করিলে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া যায়।

শিরঃশূল।

রক্ত ঊর্দ্ধগামী হইলে মস্তকে অতিশয় বেদনা হয় ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। হীন বল শ্লেষ্মা ও প্রবল বায়ুর প্রকোপ বশতঃও মস্তকে বেদনা হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে মস্তকে শীতল জল সেচন, অগুরু চন্দনাদি লেপন করিলে সবিশেষ ফল দর্শে। বর্ত্তমান সময়ে মস্তকে Ice-bag রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ও ফলপ্রদ। সোরা, ছাগদুগ্ধ, কচি বিঁপোতা একত্রে কাঁজীর সহিত বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে প্রায়ই বরফের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। পুরাতন ঘৃত, কর্পূর, বড়এলাচের দানা—একত্র মিশ্রিত করিয়া শিরোদেশে মর্দ্দন করিলে শিরঃশূল নিবারিত হয়। টাবালেবু গোবরের ঠুলিতে আবদ্ধ করিয়া ঘুঁটের আগুণে পোড়াইয়া রস রহিত করতঃ মস্তকে লাগাইলে শিরঃশূল অনেক ক্ষেত্রেই তিরোহিত হইয়া থাকে।

মূত্রাবরোধ।

ইহা ওলাউঠা রোগের একটী প্রধান দুর্লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত মূত্র নিসঃরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। রক্ত হইতেই মূত্রের উৎপত্তি। ওলাউঠা রোগে সেই রক্ত প্রথমে রূপান্তরিত হইয়া আইসে। সুতরাং মূত্র বিগঠিত হইতে পারে না। আবার মূত্রাশয়ের পথ সঙ্কুচিত বা অবরুদ্ধ হইলেও মূত্র নিরোধ উপস্থিত হয়। বরফ, সোরা ভিজান জল, কর্পূর বাসিত-শীতলজল উৎকৃষ্ট মূত্রকারক। ডাবের জলেও মূত্র সঞ্চলন ও মূত্র নিসঃরণ হইয়া থাকে। নীলমাটী, সোরা, জলাশয় নিপতিত গলিত আম্রপত্র একত্র বাটিয়া নাভি ও বস্তিদেশে প্রলেপ দিলে মূত্রস্রাব হয়। স্থলপদ্মের পাতা অথবা গাঁদা ফুলের পাতা বাটিয়া নাভির চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে মূত্রাবরোধ দূরীভূত হয়। মূত্রসঞ্চলন ও মূত্র নিঃসরণ পক্ষে নিম্নলিখিত ঔষধটী সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজ্য।

ত্রিদোষ দাবানল রস।*

পারদ গন্ধক	} (শোধিত ও কজ্জলীকৃত)	১ ভাগ
লৌহ	(শোধিত ও জারিত)	॥ ভাগ
কান্তপাষাণ	(,, ,,)	,,
যবক্ষার		,,
সাচিক্ষার		,,
সোরা		,,

এই সাতখানি দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। তারপর জলজাত পদ্মের নবপত্রের স্বরস গ্রহণ করিয়া ঐ মিশ্রিত ঔষধ মর্দ্দণ করিবে (ভাবনা দিবে)। যখন বটী বাঁধিবার উপযুক্ত হইবে, তখন দুই রতি প্রমাণ এক একটী বটী করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া রাখিবে। স্থলপদ্মের কচিপাতার রস এক তোলা ও চিনি দুই আনা সহ এক একটী বটী দুই তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করা-

* পারদং গন্ধকং লৌহং কান্ত পাষাণমেবচ।
ক্ষারদ্বয়ঞ্চ সোরঞ্চ নলিনী পত্রজ দ্রবৈঃ॥
বিভাব্য বটিকা ভাবয়েৎ স্থল পদ্মজৈঃ।
পিবা যুক্তৈ র্মুহুর্মুহুঃ যাবন্ন মূত্রোজায়তে।
—আদিত্য সংহিতা।

ইলে মূত্র সঞ্চিত ও নিঃসরিত হয়। স্থলপদ্মের অভাবে পাথরকুচি পাতার রস ॥০ তোলা ও সোরা ১ রতিসহ এই ঔষধ সেবন করাইবার বিধান আছে। উল্লিখিত ঔষধটী প্রচলিত কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত সন্ন্যাসী প্রদত্ত আদিত্য সংহিতা হইতে গৃহীত হইল। এই ঔষধমধ্যে যে কান্তপাষাণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হীরকজাতীয় এক প্রকার মূল্যবান প্রস্তর। কেহ কেহ কান্তপাষাণ শব্দে চুম্বক পাথর গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কান্তপাষাণের কথা স্থানান্তরে আমরা বিশেষরূপে বর্ণন করিব।

উদরস্ফীতি।

রোগের প্রায় শেষ অবস্থায় এই লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদরস্ফীত হইতে আরম্ভ হইলে কদাচিৎ কাহারও জীবন রক্ষিত হয়। এই সময় ঔষধ বা পথ্য কিছুমাত্র পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং সেবনীয় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশাও বড় করা যায় না। মল মূত্রাদি সম্পূর্ণ নিরোধ এবং শারীরিক যন্ত্রগুলির সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়তা অথবা ইন্দ্রিয়বর্গের গ্রহণী শক্তির বিলুপ্তি হইতেই এই লক্ষণ উপস্থিত হইতে থাকে। তবে স্বভাবের বশে কেহ কেহ বাঁচিয়াও যায়। বায়ুজন্য উদরস্ফীতিতে স্নেহ স্বেদ অর্থাৎ পুরাতন ঘৃত বা তারপিন তৈল মর্দ্দন করিয়া গরম জলে নেকড়া ভিজাইয়া পেটে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

মলমূত্র নিরোধজন্য উদরস্ফীত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে ফলও দর্শিয়া থাকে।

ত্রিকট্বাদি বর্ত্তি।*

পিপুল ।০, মরিচ ।০, শুঁঠ ।০, শ্বেতসর্ষপ ।০, গৃহধূম ০, কুড় ।০, মদনফল ।০। এই আটখানি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া সম পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে আট তোলা মধু বা গুড়ের সহিত অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ঘৃতাক্ত করিয়া অল্পে অল্পে মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহার অচিন্তনীয় প্রভাবে মল মূত্রাদির নিঃসরণ হয়। সুতরাং অন্ত্রও পরিষ্কার হইয়া উঠে। মল মূত্রের নিঃসরণ ঘটিলে উদর স্ফীতি উপদ্রবেরও অবসান হয়। আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সূত্রে যেরূপ উপায়ে সফলকাম হইয়াছি, অকপটে সরলান্তঃকরণে অনাবিল ভাষায় তাহাই প্রকাশিত করিলাম। রুচি বা তথা কথিত বিজ্ঞানের দিকে আদৌ দৃষ্টি পাত করি নাই। সূর্য্যের আলোর যেমন স্বতঃ প্রকাশ,—কুসুমের সুষমার যেমন নৈসর্গিকী বিকাশ, বালারুণের কমনীয় মধুর ছবি যেমন সত্যলব্ধ মনোমদ; প্রত্যক্ষ ফল প্রদ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি-প্রভাব তেমনি প্রত্যক্ষীকৃত সমুদ্ভাসিত সত্যসঙ্ঘ। আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—"আয়ুর্ব্বেদের" সুধীর সুধী পাঠক বৃন্দ এই অকিঞ্চনের অকি-

---

* বর্ত্তি স্ত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপ-গৃহধুম্র-কুষ্ঠমদন ফলৈঃ।
মধুনি গুডবা পক্তা পথ্যেরিতাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণা॥
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফল শনৈঃ শনৈঃ গ্রহিতা-মূতাভ্যক্তা।
আনাহোদা বর্ত্ত প্রশমনী জঠর গুল্ম নিবারিণী চ॥
—প্রয়োগে মালায়াং।

ঞ্চিৎকর প্রবন্ধ একটু প্রণিধান পূর্ব্বক আলোচনা করিবেন। মনোযোগী হইয়া চেষ্টা-শীল হইলে নিশ্চয়ই ওলাউঠা রোগে সার্ব্বজনীন বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইবেন না। আমাদিগের লিখিত ঔষধাদির প্রয়োগ-প্রণালীও বিশেষ কিছু কষ্টকর নহে। ইহার উপাদান বা উপকরণ পল্লীগ্রামের সর্ব্বত্রই অনায়াসে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, গ্রাহক বর্গের প্রসাদে, ভগ্ন ও রুগ্ন দেহে সুকিঞ্চিৎ বলাধান পাইলে পরিশিষ্টাধ্যায়ে ওলাউঠা চিকিৎসার ত্রুটী-বিচ্যুতি সমাধান করিব।

আকন্দ।

(কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন)

আকন্দের গাছ বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়ীতে ও ইহা যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের বাটীতে এই গাছটী নাই তাঁহারা যেন প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে এই বনৌষধিকে একটু স্থান প্রদান করেন। সহস্র হাসনা হেনা অপেক্ষা একটা আকন্দের গাছে মহৎ উপকার সাধিত করিয়া থাকে।

এই আকন্দের সংস্কৃত নাম অর্ক—আকন্দ, অলর্ক, শ্বেতপুষ্প, রক্তপুষ্প ইত্যাদি।

এইবার আমরা ইহার গুণ-পরিচয় প্রদান করিব।

আকন্দের পত্র, মূল, আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার আকন্দ। উভয়েরই গুণ প্রায় তুল্য।

শ্লেষ্মাধিক্য রোগে—অর্কপত্র।

বুকে সর্দ্দি বসিলে আকন্দের পাতার উপর দিকে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ বুকে বসাইয়া দিবে, তদুপরি পোটলী-বদ্ধ নেকড়া উত্তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে, ইহাতে বুকের শ্লেষ্মা সরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। নিউমোনিয়া রোগে এই স্বেদ বিশেষ ফলপ্রদ। স্বেদ অন্তে তুলা দ্বারা বুক বাঁধিয়া রাখিবে। যে কোন রোগে বুকে সর্দ্দি (কফ) বসিয়া যায়, তাহাতেই এই স্বেদে উপকার দর্শে।

বাতজ অর্শে—অর্কপত্র।

আকন্দের কোমল পত্র যে পরিমাণ লইবে, মিলিত পঞ্চলবণ তাহার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে, পরে কিঞ্চিৎ তিল তৈল ও আমরুলের শাকের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে, এই ক্ষার সিকি পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে বাতজ অর্শ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্লীহা রোগে—অর্কপত্র।

আকন্দের পত্র যে পরিমাণ গ্রহণ করিবে সৈন্ধব লবণ তাহার এক চতুর্থাংশ লইবে। একটী মাটির হাঁড়ীর মধ্যে একটী

একটী করিয়া আকন্দের পাতা বিছাইয়া দিবে, তাহার উপর সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। পুনরায় আর এক প্রস্থ পাতা পাতাইবে, তদুপরি পুনরায় সৈন্ধব চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে পত্রগুলি ও সৈন্ধব চূর্ণ উপর্য্যুপরি রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা হাঁড়ীটার মুখ কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপন করিয়া সরা ও হাঁড়ীর সংযোগস্থান বন্ধ করিয়া দিবে, এক ঘণ্টা পরিমাণ সময় ব্যাপিয়া ঐ হাঁড়ীটী জ্বলন্ত অগ্নির উপরে রাখিয়া নামাইবে, এইরূপে অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত হইবে, শীতল হইলে হাঁড়ীর সরা খুলিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে। এই ক্ষার সিকি পরিমাণ প্রত্যহ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে অতি প্রবৃদ্ধ প্লীহা নষ্ট হইয়া থাকে। ইহাকে অর্ক লবণ বলে।

উরুস্তম্ভে—অর্কপত্র।

উরুস্তম্ভ রোগীকে লবণ বর্জ্জিত তৈলাক্ত অর্কপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাইবে।

শ্বাস রোগে—অর্কপত্র ও পুষ্প।

আকন্দের পত্র ও পুষ্প সমানভাগে গ্রহণ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে, ঐ ক্বাথে যবের চাউল ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত যবতণ্ডুল দুই আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

আকন্দের মূলের ছাল চূর্ণ আকন্দের আঠায় ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, ঐ চূর্ণ দ্বারা তামাকের পাতা বেষ্টন করিয়া চুরুট প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগে ধূম পান করিলে শ্বাস রোগ নিবৃত্তি হয়।

উদরাধ্মানে—অর্কপত্র।

উদরাধ্মান হইলে আকন্দের পত্রে তৈল মাখাইয়া উদর বেষ্টনপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিলে পেট ফাঁপার উপশম হয়।

আকন্দ পাতার প্রলেপ বেদনা ও ফুলার পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

কোষবৃদ্ধি বা কুরণ্ড রোগে।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া কুরণ্ডে প্রলেপ দিলে অতি বড় কুরণ্ডও বিনষ্ট হয়। উক্ত প্রলেপ গোদে ব্যবহার করিলে গোদ নষ্ট হয়। একশিরা রোগে আকন্দের পত্র দ্বারা কোষ বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে একশিরা আরোগ্য হয়।

মুখে মেচেতা (কালো কালো দাগ) পড়িলে আকন্দের আঠার সহিত হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে মেচেতা আরোগ্য হয়।

চোক উঠায়—আকন্দমূলের ছাল।

আকন্দমূলের ছাল ১ তোলা কুট্টিত করিয়া এক পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে, ১৫ মিনিট সিদ্ধ হইলে উহা শীতল করিয়া দিবসে ২।৩ বার ৪।৫ ফোঁটা করিয়া চক্ষে প্রদান করিবে। চক্ষু চুলকানি, লাল হওয়া বেদনা ও ভার বোধ ও চক্ষুর পিচুটীর ন্যায় হইয়া চোক ওঠা আরোগ্য হয়।

কর্ণশূলে—আকন্দ।

আকন্দ পত্র উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিবে, ঐ ঈষদুষ্ণ রস কর্ণাভ্যন্তরে ২।১ ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে কর্ণ শূল (কাণের মধ্যে বেদনা) নিবৃত্তি হয়।

কুকুর দংশন বিষে—আকন্দ।

উত্তমরূপে কুটিত তিল ২ তোলা, ইক্ষু গুড় ২ তোলা, এবং কিছু শুষ্ক আকন্দের আঠা (এক সিকি) একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে কুকুর দংশিত বিষ নষ্ট হয়।

কুষ্ঠ রোগে—আকন্দ।

যে কুষ্ঠ রোগীর ক্ষতে পোকা জন্মিয়াছে তাহাতে শ্বেত ও রক্ত আকন্দের মূল, পত্র ও ডাঁটার সহিত সম্ম পরিমাণ ছাতিমছাল লইয়া ক্বাথ করিয়া ঐ ক্বাথ পান করাইলে কুষ্ঠের কৃমি নষ্ট হয়।

বাত বেদনায়—আকন্দ।

কোন স্থানে বাত জনিত বেদনা কিম্বা আঘাত জনিত ফুলিলে আকন্দের পত্র গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বেদনা ও ফুলার উপশম হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আকন্দ।

বিছা, ভিমরুল বা বোলতা দংশিত স্থানে আকন্দের আঠা লাগাইলে জ্বালা নিবৃত্তি হয়।

বেদনা ও স্ফীতিযুক্ত সন্ধিস্থানে আকন্দের আঠার প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

জানিয়া রাখা উচিত, আকন্দের আঠা বিষাক্ত, উহা উদরস্থ হইলে অতি বিরেচন ও অতি বমন হয়। চোখে লাগিলে চক্ষুর হানি করে। এজন্য আকন্দের আঠার ব্যবহার অতি সাবধানে করা উচিত।

মস্তিষ্ক-কাহিনী।

("হিন্দুস্থান" হইতে গৃহীত)

মস্তিষ্ক হইতেছে মন চালাইবার যন্ত্র। এই যন্ত্রটির সাহায্যে আমাদের চারিদিকে কি হইতেছে, সেটা আমরা বুঝিতে পারি এবং ইহারই সাহায্যে আমরা আমাদের ইচ্ছা-শক্তি চালনা করি।

কিন্তু এই মস্তিষ্কের কল-কব্জার কোন জায়গা সামান্য একটু বিগড়াইয়া গেলেই, মানুষের ব্যবহার একেবারে সৃষ্টিছাড়া হইয়া যায়। মানুষ যে-ভাবে চলিতে, ছুটিতে ও নাচিতে শেখে, ঠিক সেই ভাবেই সে লিখিতে, পড়িতে ও বানান করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল, একটি শিক্ষিত মানুষ বেশ লিখিতে পারিতেছে অথচ মোটেই পড়িতে পারিতেছে না। ইহার কারণ কি?

যে স্নায়ু-কেন্দ্রের (Nerve-centres) দ্বারা বাক-যন্ত্র চালিত হয়, সাধারণতঃ তাহা মানুষের মস্তিষ্কের পার্শ্বে থাকে। কিন্তু কোন কারণে এখানে যদি একচাপ রক্ত বা আর কিছু আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই মানুষের পক্ষে চাঁচাইয়া বই পড়া বা কাহারও কথার পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব হইয়া ওঠে! অথচ শোনা কথা সে বুঝিতে পারিবে এবং বই দেখিয়া লিখিতে পারিবে! কারণ যে যে

স্নায়ু-কেন্দ্র হস্ত চালনা এবং চাক্ষুষ স্মৃতিকে নিয়মিত করে, সেগুলি মস্তিষ্কের সুস্থ অংশে অবস্থিত।

মস্তিষ্কের মধ্যে হের-ফের ঘটিলে, আরো অনেক অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখা যায়। সময়ে সময়ে একজন মানুষ অন্যান্য সমস্ত শব্দ, গান ও গোলমাল শুনিতে পায়, কিন্তু কথিত বাক্য কিছুতেই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না! সে লিখিতেও পারে, পড়িতেও পারে, কিন্তু তাহার মাতৃভাষায় কথিত বাক্য শুনিলেও সে মনে করিবে বনমানুষ বা বাঁদরের অর্থহীন 'কিচির মিচির' শুনিতেছে! সে একেবারে "word-deaf" বা "কথা-কালা" হয় বলিয়া তাহার দ্বারা শ্রুতি-লিখনের কাজও চলে না। মস্তিষ্কের শ্রুতি-কেন্দ্রে গোলমাল হইলে মানুষের এমনি শোচনীয় দশা হয়।

"চাক্ষুষ-স্মৃতি-কেন্দ্র" (visual memory centre) মস্তিষ্কের ঠিক পিছনদিকে থাকে। এই অংশে আঘাত লাগিতে বা পাড়া উপস্থিত হইতে মানুষ "বাক্যান্ধ" হইয়া পড়ে। অর্থাৎ অনেকদিনের অভ্যস্ত বাক্যমূলক স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া যায়। কিংবা সে বিশেষ এক একটি অক্ষর দেখিয়া একেবারেই চিনিতে পারে না।

কোন কোন লোক ততক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বানান করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহা কালি-কলমে কাগজের উপরে লিখিয়া দেখে। যতক্ষণ না লিখিতে পারে, ততক্ষণ তাহাদের সন্দেহ থাকিয়া যায়, কথাগুলির বানান শুদ্ধ হইল কিনা! এখানে মস্তিষ্কের স্মৃতির চেয়ে হাতের মাংসপেশীর স্মৃতি প্রখর হইয়া থাকে। ইউরোপের অনেক বিখ্যাত পিয়ানো বাদকেরই এই দশা! তাঁহারা "মাংসপেশী-স্মৃতি"র (muscle memory) উপরেই বেশী নির্ভর করিয়া থাকেন; কারণ, অনেক সময়েই দেখা গিয়াছে, যে সমস্ত অনেক-দিনের পুরাণো সুর কিছুতেই তাঁহাদের মাথায় আসে না, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই পিয়ানোর ভিতরে সেই সব বিস্মৃত সুর বাজিয়া ওঠে!

বিলাতী ডাক্তারদের কেতাবে কতকগুলি আশ্চর্য্য ও কৌতুককর রোগীর কাহিনী পাঠ করা যায়। সে সব রোগে মানুষের অন্য কোনরকম যন্ত্রণা দেখা যায় না বটে, কিন্তু বেচারী রোগীদের পক্ষে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া পৃথিবীতে বাস করা দস্তরমত শক্ত হইয়া পড়ে। তখন মরার কষ্টের চেয়ে বাঁচার কষ্টই বেশী হইয়া দাঁড়ায়। আমরা এই রকম একটি বিচিত্র রোগের বর্ণনা করিব?

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সমস্ত জিনিষ উল্টা দেখে! অর্থাৎ উপরিদিকটা নীচের দিকে এবং নীচের দিকটা দেখে উপরিদিকে! এ সব রোগী যদি ঠিক সোজাসুজি দেখিতে চায়, তবে "পা'দুটো সব উপর করে মাথা দিয়ে" হাঁটিতে হয় এবং সে অবস্থাটা কাহারও পক্ষে বিশেষ আরামপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে না। অবশ্য বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যই মানুষেরা দৃষ্টি-পটের উপরে আগে উল্টাভাবে ফুটিয়া ওঠে। চোখের "retina" বা ছায়াপটের সেই উল্টা প্রতিচ্ছবি আবার সোজা হয়, মস্তিষ্কের "চাক্ষুষ স্মৃতি কেন্দ্রে"র দ্বারা। যাহাদের

মস্তিষ্কের ঐ অংশটি বিকল হইয়া যায়, তাহারা তাই সমস্ত দৃশ্যই উল্টাভাবে দেখিয়া থাকে।

যাহাকে বলে "optic nerve" বা "দৃষ্টি-স্নায়ু" তাহা অন্ধ। এই জন্য উক্ত "দৃষ্টি-স্নায়ু" যেখানে চক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে, বৈজ্ঞানিকেরা সেই স্থানটিকে "blind spot" বলিয়া থাকেন। দৃষ্টি-স্নায়ু"র দর্শন ক্ষমতা নাই, দর্শনের শক্তি আছে চোখের ঐ "ছয়োপটে"র।

শুধু উল্টাভাবে দেখা নয়; কেহ কেহ সেই সঙ্গে গান গাহিবার সময়ে কড়া পর্দ্দা কোমলে এবং কোমলকে কড়ি করিয়া উচ্চারণও করে। আর একটি বালিকা সমস্ত ব্যাপারেই পিছন বা শেষ হইতে সুরু করিত। এই সব রোগীর হৃৎপিণ্ড যথাস্থানেই আছে বটে, কিন্তু তাহাদের দেহের অন্যান্য যন্ত্র এবং মস্তিষ্ক অস্থানে অবস্থিত। তাই তারা সমস্তই উল্টাদিকে দেখিয়া থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।—হরিদ্বারে আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছেন। অনারেবল লালা সুখবীর সিং ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের মত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সকরুণ দৃষ্টি কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের উপর পতিত হইলে এই কলেজকে সমুন্নত করিতে অধিক দিন লাগে না। আমরা এজন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের করুণা ভিক্ষা করিতেছি।

আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয়।—যশোহর জেলাবোর্ড হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়া যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত লইয়াছে, সেই উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের অণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ জ্যাকসন্ কমিশনর বাহাদুরকে জানাইয়াছেন যে, "এই অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসালয় স্থাপন সম্বন্ধে যে বিধান প্রচলিত আছে, তাহার সমস্ত নিয়ম আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে না। ইহার পরিচালনার জন্য যে সমিতি থাকিবে, তাহাতে সিবিল সার্জ্জনকেও সব ডিবিসন্যাল মেডিকেল অফিসারকে সভ্য পদে মনোনীত রাখিতে হইবে না, কিন্তু বিভাগীর কমিশনর বাহাদুরের সম্মতি লইয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে।" আমরা এই ব্যবস্থায় যেরূপ সুখী হইয়াছি, সেইরূপ ইহাতে আমাদের মনে এমন আশারও সঞ্চার হইয়াছে যে, মহামান্য গবর্ণমেণ্টের কৃপায় লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আবার মাথা তুলিতে সমর্থ হইবে। মেডিকেল ডিপার্টমেণ্টের রেজেষ্ট্রীভুক্ত ডাক্তার ভিন্ন ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা আগে ছিল না, কিন্তু যশোহরের এই চিকিৎসালয়ের সদস্য রূপে রেজিষ্ট্রী বহির্ভূত চিকিৎসকগণও স্থান পাইবেন। আমরা বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের এই নূতন ব্যবস্থার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

IMPERIAL

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—আষাঢ়। | ১০ম সংখ্যা।

শারীর বিদ্যা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী এম, এ, এল, এম, এস।]

অন্তস্তলে চারিটী পেশী সংলগ্ন থাকে। ঐ কলায়কদ্বয়ের মূল হইতে ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্‌ভাবে দুইটী রেখা পশ্চাদ্‌দিকে গিয়াছে, উহাদিগকে 'আন্তরতিরশ্চীনা' বলে। উহাতে 'মুখভূমি-কণ্ঠিকা' পেশী সংবদ্ধ থাকে। এই রেখার উপরিভাগে সম্মুখদিকে 'জিহ্বাধরীয়' লালা-গ্রন্থি ধারণের জন্য তন্ত্রামক খাত এবং অধো-দিকে পশ্চাদ্ ভাগে 'হনুধরী'য় লালাগ্রন্থি ধারণের জন্য তন্ত্রামক খাত আছে।

অধোহনুমণ্ডলের ঊর্দ্ধধারা দন্তোদূখল-মণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে। হনুমণ্ডলের প্রত্যেক অর্দ্ধভাগে বাল্যে পাঁচটী করিয়া এবং যৌবনে আটটী করিয়া দন্তোদূখল থাকে। বৃদ্ধ বয়সে ঐগুলি ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। উক্ত ঊর্দ্ধধারার পশ্চার্দ্ধদ্বয়ে 'কপো-লিকা' নামে পেশী সংযুক্ত হয়। দন্তগুলির বিষয় সমগ্র করোটিবর্ণনে বলা যাইবে।

অধোধারা স্থূলাগ্র এবং কেবল ত্বকের দ্বারা আবৃত। ইহার পশ্চাতের দুই প্রান্তের নিকটে বক্ত্র ধমনী ধারণের জন্য 'বক্ত্রধমনী-পরিখা' নামে দুইটী পরিখা আছে।

(২) হনুকূটদ্বয়— হনুমণ্ডলের পশ্চাৎ প্রান্তদ্বয় হইতে উদ্গত চতুষ্কোণবিশিষ্ট দুইটী প্রবর্দ্ধন। চরকসংহিতায় উহাদিগকে 'হনুমূল-বন্ধন' বলা হইয়াছে।

প্রত্যেক হনুকূটের দুইটী শিখর—সম্মুখে হনুকুম্ভ ও পশ্চাতে হনুমুণ্ড; দুইটী তল—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল; এবং চারিটী ধারা

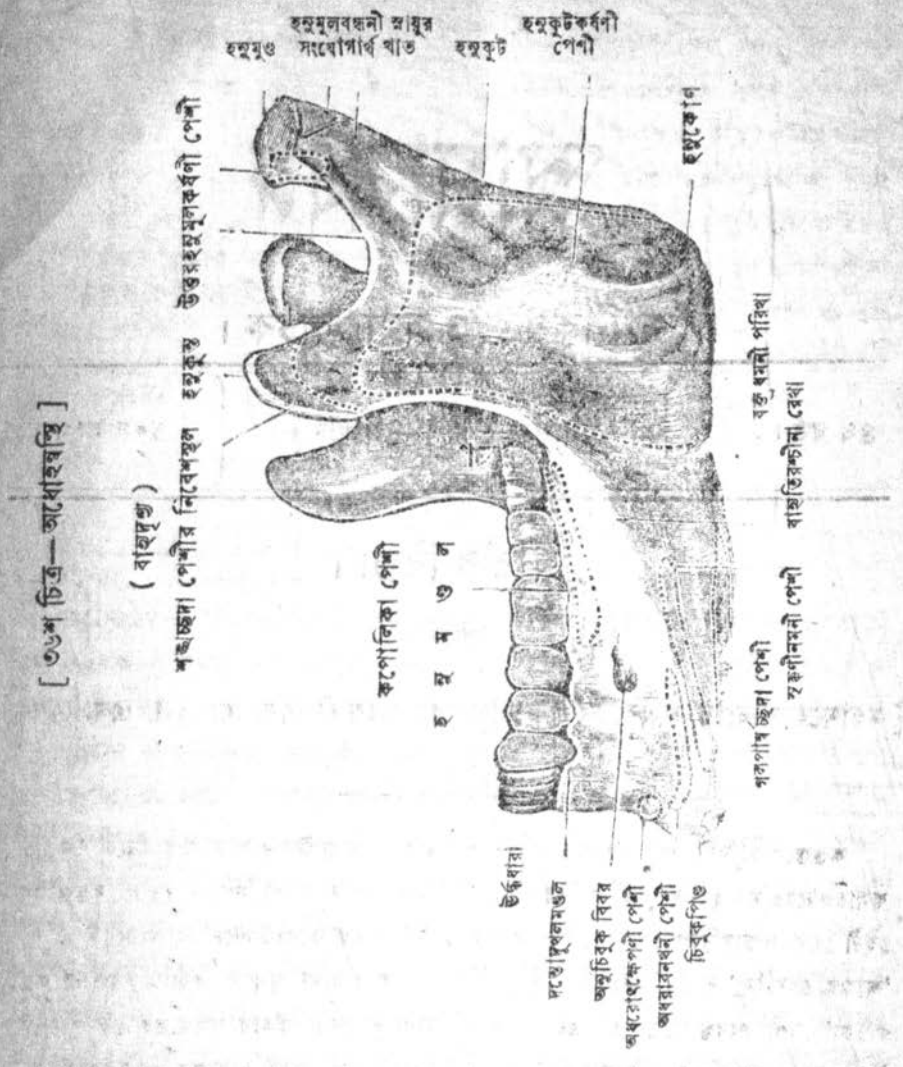

[৩৬শ চিত্র—অধোহনুস্থি]

—সম্মুখ ধারা, পশ্চাৎ ধারা, উত্তর ধারা ও অধর ধারা।

হনুমুণ্ড—প্রায় গোলাকার, ইহা শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ইহার মূলের চারিদিকে স্নায়ুকোষ সংলগ্ন থাকে এবং আভ্যন্তরতলের মূলদেশে 'উত্তরাহনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়।

হনুকুম্ভ—প্রায় ত্রিকোণ এবং কুম্ভাগ্র সদৃশ। ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তর তলে 'শঙ্খচ্ছদা' পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে।

হনুকূটের বহিস্তলে 'হনুকূটকর্ষণী' এবং অন্তস্তলে 'অধরা হনুমূলকর্ষণী' পেশী সংসক্ত হয়। অন্তস্তলের মধ্যদেশে 'অধরা দন্তমূলসুড়ঙ্গা' প্রণালীর দ্বারভূত যে বিবর আছে, তাহার ভিতর দিয়া 'অধরদন্তমূলিকাখ্য' সিরাধমনী ও নাড়ী দন্তোদূখলগুলির মূলদেশে শে

প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকূটের উর্দ্ধধারা অর্দ্ধচন্দ্রাকার, ইহার ভিতর দিয়া 'হনুকূট কর্ষণী' পেশীর চতুর্দ্দিকে নাড়ী সিরা ধমনী সকল প্রবেশ করিয়া থাকে। হনুকূটের অধোধারা হনুমণ্ডলের অধোধারার সহিত সমরেখায় অবস্থিত। অধোধারার পশ্চাদ্ ভাগে 'হনুকোণ' নামে কোণ আছে এবং উহাতে 'হনুকোণিকা' স্নায়ু আবদ্ধ থাকে। হনুকূটের সম্মুখধারা পাতলা ও পেশীর মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত; পশ্চাৎ ধারা স্থূল ও 'কর্ণমূলিকাখ্য' গ্রন্থিসমাচ্ছন্ন।

সন্ধি—অধোহনুস্থির মুণ্ডদ্বয় উভয় শঙ্খাস্থির হনুসন্ধিখাতের সহিত সন্ধিযুক্ত।

পেশী—অধোহনুস্থিতে পনেরো জোড়া পেশী সংসক্ত হইয়া থাকে। বিবরণ পরে বর্ণনীয়।

অধোহনুস্থি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা এই যে বাল্যকালে হনুকূটদ্বয় হনুমণ্ডলের উপর তির্য্যক্‌ভাবে নিবিষ্ট থাকে, যৌবনে সমকোণভাবে নিবিষ্ট হয় এবং বার্দ্ধক্যে দন্ত পড়িয়া যাওয়ায় দন্তোদূখলগুলি বিলীন হয় ও তজ্জন্য অধোহনুমণ্ডলের এক এক দিক নৌকার ন্যায় বক্রতা প্রাপ্ত হয়।

কণ্ঠিকাস্থি*—কণ্ঠিক বা জিহ্বামূলিক নামক অশ্বখুরাকার ও নানা পেশীসংযুক্ত অস্থিখণ্ড শ্বাসপথের সম্মুখে ও জিহ্বার মূলদেশে অবস্থিত। ইহা সুদীর্ঘ স্নায়ুরজ্জু দ্বারা শঙ্খাস্থির 'মূলশিফা'দ্বয়ে প্রতিবদ্ধ হইয়া শূন্যে লম্বিত ভাবে থাকে। ইহার তিনটী অংশ—কণ্ঠিকপিণ্ড, মহাশৃঙ্গদ্বয় ও লঘুশৃঙ্গদ্বয়।

[৩৭শ চিত্র—কণ্ঠি কাস্থি]

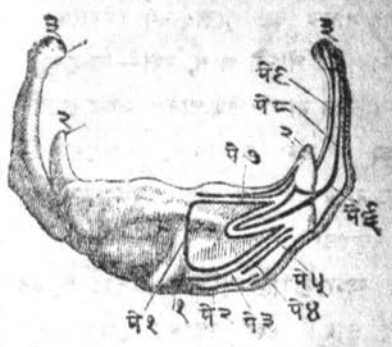

(১) ১—কণ্ঠিকপিণ্ড। (২, ২) ২, ২—লঘুশৃঙ্গদ্বয়। (৩, ৩) ৩, ৩—মহাশৃঙ্গদ্বয়। (পে) 'পে' চিহ্নিত স্থানগুলি পেশী নিবেশ স্থল।

(১) মধ্যস্থিত পিণ্ডাকার অংশকে 'কণ্ঠিকপিণ্ড' বলে। উহার সম্মুখতলে এক এক দিকে ছয়টী করিয়া দ্বাদশটী পেশীসংসক্ত থাকে। যথা—চিবুককণ্ঠিকা, উরঃকণ্ঠিকা, চিবুকজিহ্বাকণ্ঠিকা, মুখভূমিকণ্ঠিকা, শিফাকণ্ঠিকা এবং অংসকণ্ঠিকা। কণ্ঠিকপিণ্ডের পৃষ্ঠতল মসৃণ এবং 'গোজিহ্বা' নামে কলায় সহিত সম্বদ্ধ।

(২) মহাশৃঙ্গদ্বয়—মধ্যপিণ্ডের উভয় দিকে পশ্চাদ্ ভাগে প্রসারিত। উহাদের অগ্রকোটদ্বয়ে স্নায়ুরজ্জু সংযোগের জন্য দুইটী অর্ব্বুদ আছে। প্রত্যেক শৃঙ্গে তিনটী করিয়া পেশী সম্বদ্ধ থাকে। যথা—মধ্যমা কণ্ঠসংকোচনী, জিহ্বাকণ্ঠিকা এবং অবটুকণ্ঠিকা।

(৩) লঘুশৃঙ্গদ্বয়—মহাশৃঙ্গদ্বয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহাদের অগ্রকোটিদ্বয়ও স্নায়ুরজ্জুদ্বারা শঙ্খাস্থির শিফাদ্বয়ের সহিত প্রতিবদ্ধ থাকে।

সমগ্র করোটি বর্ণনা।

মস্তকের সমস্ত অস্থি সংহিত হইয়া করোটি নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে অধোহনুসন্ধি ব্যতীত

* ইং—Hyoid—হায়য়েড।

অন্যান্য সন্ধিগুলি অচল। করোটির অস্থি সকলের সন্ধির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

করোটির পাঁচটী অংশ, যথা—**করোটি পটল** নামক ঊর্দ্ধপ্রদেশ, **করোটি ভূমি** নামক অধোদেশ, **করোটি পক্ষ** নামে দুই পার্শ্ব এবং **মুখমণ্ডল** নামে সম্মুখভাগ।

করোটিপটল—শিরঃসম্পুটের ছাদের ন্যায়। ইহা সম্মুখে পুরঃকপালের ললাটফলক, দুই পার্শ্বে দুই পার্শ্বকপালাস্থি এবং পশ্চাতে পশ্চিমকপালের ঊর্দ্ধভাগ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার দুইটী তল, যথা—বাহ্যতল ও আভ্যন্তরতল। তন্মধ্যে বাহ্যতল—কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার এবং তাহাতে পাঁচটী 'সীমন্ত' বা সন্ধিরেখা আছে, যথা—সম্মুখ সীমন্ত, পশ্চিম সীমন্ত ও দুইটী পার্শ্ব সীমন্ত (৩৮শ চিত্র দেখ)। তন্মধ্যে করোটিপটলের দুই পার্শ্বে অবস্থিত সন্ধিরেখা দুইটীকে পার্শ্বসীমন্ত বলে। এই স্থানে ঊর্দ্ধস্থিত তিন খানি অস্থির (যথা পুরঃ-পার্শ্ব-পশ্চিম কপালের) সহিত অধঃস্থিত তিন খানি অস্থির (গণ্ডাস্থি-জতূকাস্থি-শঙ্খাস্থির) সন্ধি হইয়া থাকে।

এই কয়টী সন্ধি ব্যতীত সম্মুখকপালের উভয়ার্দ্ধের মধ্যে যে সূক্ষ্ম 'গূঢ়সীমন্ত' আছে, উহা বাল্যকালে দেখা যায়, ক্বচিৎ প্রৌঢ়বয়সেও থাকে।

[৩৮শ চিত্র—করোটিপটল (স্তন্যপায়ী শিশুর)]

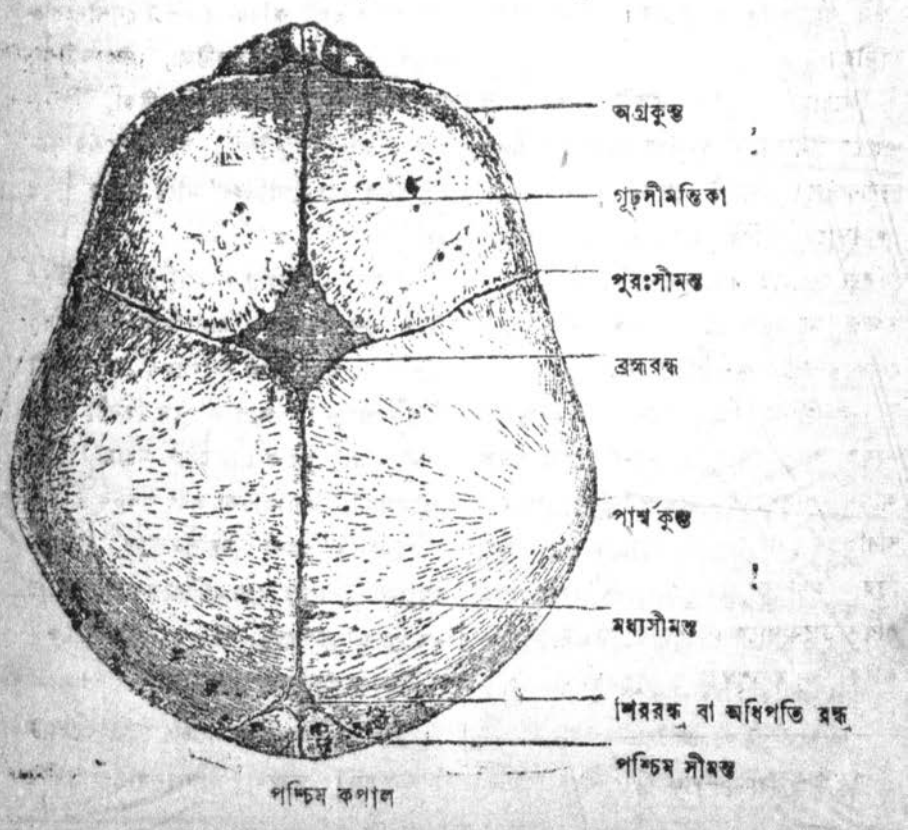

পুরঃসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থানকে 'ব্রহ্মরন্ধ্র' বা 'ব্রহ্মতালু' এবং পশ্চিমসীমন্ত ও মধ্যসীমন্তের সন্ধিস্থলকে 'শিবরন্ধ্র' বলে। অধিপতি মামক মর্ম্মের আধার বলিয়া উহা 'অধিপতি রন্ধ্র' নামেও কথিত। ব্রহ্মরন্ধ্র প্রায় চতুঃকোণ ও অধিপতি রন্ধ্র ত্রিকোণ। এই উভয় স্থলই শৈশবে কোমল থাকে।

করোটিপটলের আভ্যন্তরতল খাতোদর। মস্তিষ্কচ্ছদা কলা ও তাহার গ্রন্থিসমূহ এবং উক্ত কলাপোষণী ধমনীর শাখা প্রশাখা ইহার সহিত সংলগ্ন থাকে। ইহার মধ্যরেখায় 'দীর্ঘিকা সিরাপরিখা' নামে খাত আছে, উহা মধসীমন্তের সহিত সমসূত্রে ভিতরে অবস্থিত।

করোটি ভূমি—ইহা বহু অস্থি সংঘাতে নির্ম্মিত এবং বিশেষ উচ্চাবচ। ইহার দুইটী তল। শিরোগুহার মধ্যে গূঢ় ভাবে অবস্থিত ঊর্দ্ধ তলটী 'করোটিপীঠ' বা 'মস্তিষ্কপীঠ' নামে খ্যাত। অধস্তল মুখবিবর ও গলার আচ্ছাদন স্বরূপ, উহা করোটিভূমিতল বা করোটিতল নামে অভিহিত।

দশ খানি অস্থিসংযোগে করোটিভূমি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যথা—সম্মুখে ঊর্দ্ধহনুস্থিদ্বয় ও তালুস্থিদ্বয়, পশ্চাতে পশ্চিমকপাল, মধ্যভাগে ঝর্ঝরক, জতূকা ও সীরিকা এবং দুই পার্শ্বে শঙ্খাস্থিদ্বয়।

করোটি পাঠ ও করোটিতল সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়য়কটী কথা এস্থলে বলা হইতেছে। বিশেষ বিবরণ অস্থিগুলির বর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

করোটিপীঠ বা মস্তিষ্কপীঠ—ইহা করোটিভূমির তিনটী মহাখাতবিশিষ্ট ঊর্দ্ধতল। তন্মধ্যে সম্মুখের খাতে মস্তিষ্কের পুরঃপিণ্ড, মধ্যখাতে উহার মধ্যপিণ্ড এবং পশ্চাৎ খাতে উহার পশ্চিমপিণ্ড, অনুমস্তিষ্ক ও সুষুম্নাশীর্ষক থাকে।

করোটিতল বা করোটিভূমিতল মুখগলাদিবিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ এবং অত্যন্ত উচ্চাবচ। ইহার তিনটি ভাগ, যথা—পুরোভাগ, মধ্যভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ। পুরোভাগে ঊর্দ্ধ দন্তোদূখলমণ্ডল ও তালুপটল (তালুর ছাদ) বিশেষ দর্শনীয়। মধ্যভাগে কণ্ঠপটল বা গলার ছাদ অবস্থিত। পশ্চাদ্ভাগে দুইপার্শ্বে অধোহনুর সহিত সন্ধির স্থালকদ্বয় এবং কর্ণকুহরদ্বয় দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে এস্থলে দন্তোদূখলমণ্ডলের বিষয় বিশেষভাবে বলা হইতেছে।

দন্তোদূখল মণ্ডল—উপরের হনুমণ্ডলে ষোলটী ও অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী দন্তোদূখল বা দন্তধারণের গর্ত্ত থাকে। এস্থলে করোটিতল প্রসঙ্গে উপরের ষোলটী বর্ণনীয় (নিম্নের ষোলটীও এইরূপ, তাহাদের বিষয় অধোহনু প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে)। প্রতি অর্দ্ধভাগে আটটী করিয়া দন্ত থাকে, তন্মধ্যে মধ্যরেখার পার্শ্বের দুইটী 'কর্ত্তনক' *, তাহাদের পশ্চাতের একটী 'রদনক' †, তাহাদের পশ্চাতের দুইটী 'অগ্রচর্ব্বণক' ‡ এবং শেষের দিকের তিনটী 'পশ্চিম চর্ব্বণক' § নামে অভিহিত। অষ্টম বা শেষের চর্ব্বণক

---

* ইং—Incissors—ইন্‌সাইজারস্।
† ইং—Canine—ক্যানাইন্।
‡ ইং—Pre-Molars—প্রি-মোলাস।
§ ইং—Molars—মোলাস।

দন্ত "জ্ঞানদন্ত" (আক্কেল দাঁত) নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই দন্ত যৌবনের শেষে বা প্রৌঢ় বয়সে উদ্গত হয়।

ঊর্দ্ধহনুমণ্ডলে মধ্যরেখার দুই পার্শ্বের দুইটী দন্তকে প্রাচীনেরা 'রাজদন্ত' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে প্রৌঢ় বয়সে ঊর্দ্ধ হনুমণ্ডলে এবং অধোহনুমণ্ডলে ষোলটী করিয়া বত্রিশটী দন্ত থাকে। কিন্তু বাল্যকালে প্রত্যেক হনুমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে পাঁচটি করিয়া —সমগ্র হনুমণ্ডলে মোট কুড়িটী বিনশ্বর দন্ত থাকে। বাল্যাবস্থায় পশ্চাদ্ ভাগের চর্ব্বণক দন্তগুলি থাকে না।

শৈশবে সাধারণতঃ ৬।৭ মাস হইতে প্রায়ই জোড়া জোড়া করিয়া দন্ত উদ্গত হইতে থাকে। কখন কখন ইহার পূর্ব্বে— কচিৎ ভ্রূণাবস্থাতেও দন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

প্রাপ্তবয়স্কের দন্তের ন্যায় বাল্যাবস্থার দন্তের সুদীর্ঘ মূল থাকে না। প্রায়ই পাঁচ বৎসর বয়স হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল দন্ত পড়িয়া যায় এবং নূতন স্থায়ী দন্ত উদ্গত হইতে থাকে।

করোটিতলের প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে বহুপেশী সংযুক্ত থাকে। তাহাদের বিষয় পেশীবর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইবে।

করোটি পক্ষদ্বয়—(বিংশ চিত্র দেখ) করোটিপক্ষ বা করোটির পার্শ্বদেশ দুইটী। প্রত্যেকটী প্রায় ত্রিকোণাকার— কতকটা আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। উহার ঊর্দ্ধসীমা 'শঙ্খতোরণিকা, রেখার অনুগামিনী ও অপাঙ্গ হইতে পশ্চিমসীমন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অধঃসীমা অধোহনুর কোণ।

প্রত্যেক করোটিপক্ষের দুইটী অংশ— হনুসন্ধিস্থালকের অগ্রে অবস্থিত সম্মুখভাগ এবং উহার পশ্চাতে অবস্থিত পশ্চিমভাগ। সম্মুখভাগে দর্শনীয় তিনটী খাত আছে, যথা —শঙ্খখাত, গণ্ডোত্তরখাত এবং হনুজাতুক খাত।

প্রথমোক্ত দুইটী খাত এক হইলেও গণ্ডচক্রের ঊর্দ্ধ ও নিম্নাংশ ভেদে ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উভয় খাতে শঙ্খচ্ছদা পেশী এবং নিম্নস্থ খাতে পঞ্চম নাড়ীর হানব্য শাখা ও সিরা ধমনী থাকে।

তৃতীয় খাত বা হনুজাতুক খাত ঊর্দ্ধহনুস্থি ও জতূকাস্থির বৃহৎ পক্ষতির সন্ধানস্থলে অবস্থিত। ইহা ত্রিকোণাকার ও নেত্রগুহার পশ্চাতে থাকে। ইহার পূর্ব্বসীমায় ঊর্দ্ধহনুর পশ্চিমার্ব্বুদ এবং পশ্চিম সীমায় জতূকাস্থির চরণফলকদ্বয় অবস্থিত। ইহা হনুজাতুকা, হনুচরণিকা এবং পক্ষান্তরালা নামে তিনটী গূঢ় পরিখার কেন্দ্র স্বরূপ। নেত্রগুহা, নাসা-গুহা, মুখগহ্বর, মস্তিষ্কগুহা এবং গণ্ডোত্তর খাতের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। সগ্রন্থিকা ঊর্দ্ধহানব্য নাড়ী এবং আন্তরহানব্যা ধমনী এই খাতে অবস্থিতি করে। এই খাতটীর প্রসঙ্গ ধমনী ও নাড়ীবর্ণনে বিশেষ আবশ্যক হইবে।

করোটির সম্মুখভাগ—করোটির সম্মুখভাগ প্রায় গোল, ইহা মুখ-মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার ঊর্দ্ধসীমা ভ্রূমধ্য ও ভ্রূতোরণিকাদ্বয়; অধঃসীমা অধো-

হনুমণ্ডল; এবং দুই পার্শ্বের সীমা উভয় গণ্ডাস্থি ও অধোহনুকূট।

ইহার মধ্যভাগে ভ্রূমধ্য ও তাহার উভয় পার্শ্বে ভ্রূতোরণিকা রেখাদ্বয়, সংহিত নাসাস্থি-দ্বয় বা 'নাসাসেতু' ত্রিকোণ নাসাগহ্বর বা 'নাসাপুরোদ্বার,' আটটী কর্ত্তনক দন্ত (উপরে চারিটী ও নীচে চারিটী) এবং চিবুকপিণ্ড বিশেষভাবে দর্শনীয়। উভয় পার্শ্বের এক এক দিকে নেত্রগুহা, গণ্ডকূট ও বারটী দন্ত (উপরে নিম্নে একটী করিয়া রদনক দন্ত ও পাঁচটী করিয়া চর্ব্বণক দন্ত) এবং বহ্বনাড়ী ও ধমনীর পরিখা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক দিকে ষোলটি করিয়া পেশী আছে—তাহাদের বিষয় যথাস্থানে বর্ণনীয়।

নেত্রগুহা।

নেত্রগুহা বা নেত্রকোটর ধুতুরা ফুলের ন্যায় সম্মুখে আয়ত ও পশ্চাতে সঙ্কুচিত। ইহারা দুইদিকে দুইটী নেত্রগোলক ধারণ করে। প্রত্যেক নেত্রকোটরের চারিদিকের প্রাচীর সাতখানি অস্থির সংযোগে নির্ম্মিত। তন্মধ্যে চারিখানি দ্বারা গুহাদ্বয়ের পরিধি নির্ম্মিত হয় এবং তিনখানি গুহামূলের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। সাতখানি অস্থি যথা—

(১) অশ্রুপীঠ—ইহা 'অশ্রু-বাহিকা' ধারক ও অন্তঃপরিধিস্থিত। (২) পুরঃ-কপালের নেত্রচ্ছদিফলক—উর্দ্ধপরিধিস্থ। (৩) উর্দ্ধহনুস্থির নেত্রপীঠফলক—ইহা নেত্রভূমিনিষ্পাদক ও অধঃপরিধিস্থ। (৪) গণ্ডাস্থির অক্ষিফলক—বহিঃপরিধিস্থ। (৫) জতূকাস্থির পক্ষতিদ্বয়; (৬) তাবস্থির চূড়াস্থ প্রবর্দ্ধন; (৭) ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃপীঠ; শেষোক্ত তিনখানি নেত্রগুহামূলের নির্ম্মাপক।

ইহাদের মধ্যে জতূকা, ঝর্ঝরক ও অগ্র-কপাল—এই তিনখানি অস্থি উভয় নেত্র-গুহার নিষ্পাদক—এজন্য উভয় নেত্রগুহায় মোট অস্থিসংখ্যা—১৪খানি না হইয়া ১১খানি হইয়াছে।

প্রত্যেক নেত্রগুহার ছয়টী অংশ, যথা—

(ক) নেত্রগুহাদ্বার ইহা বৃহত্তর ও বৃত্তপ্রায়।

(খ) নেত্রগুহামূল—ইহা ধুতুরাফুলের গোড়ার দিকের মত সঙ্কুচিত। এখানে 'দৃষ্টিনাড়ীরন্ধ্র' এবং 'পক্ষান্তরাল' নামক খাত দৃশ্যমান, উহাদের মধ্য দিয়া দৃষ্টিনাড়ী, তৃতীয় নাড়ী ও নেত্রের সিরাধমনীগুলি নেত্রগোলকে প্রবেশ করে।

(গ) নেত্রগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্র-কপালের নেত্রচ্ছদিফলক এবং জতূকাস্থির লঘুপক্ষতির সংযোগে নির্ম্মিত। ইহার বহিঃকোণে 'অশ্রুগ্রন্থি' ধারণের জন্য একটী ক্ষুদ্র খাত এবং অন্তঃকোণে 'বক্রোর্দ্ধদর্শিনী' নেত্রপেশীর নিবেশ স্থান।

(ঘ) নেত্রগুহাভূমি—এই অংশ সমতল-প্রায়। ইহার অধিকাংশ উর্দ্ধহনুস্থির নেত্র-পীঠফলকের দ্বারা এবং কিয়দংশ গণ্ডাস্থি ও তাবস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

(ঙ) অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উর্দ্ধহনুর নাসা-কূটপার্শ্ব, অশ্রুপীঠ, ঝর্ঝরাস্থির নেত্রান্তঃফলক এবং জতূকাস্থির শরীরের অত্যল্প অংশ দ্বারা নির্ম্মিত। এইস্থানে নাসাভিমুখী 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালী আছে। অধিক অশ্রুপাত হইলে এই পথে নাসিকার মধ্যে অশ্রু প্রবেশ করে।

(চ) বহিঃ প্রাচীর—ইহা পূর্ব্বার্দ্ধে গণ্ডাস্থির অক্ষিফলকের দ্বারা এবং পশ্চার্দ্ধে জতূকাস্থির বৃহৎ পক্ষতি দ্বারা নির্ম্মিত। এই অংশে 'শঙ্খগণ্ডিকরন্ধ্র' নামে একটী বা দুইটী বিবর আছে।

ভিন্ন ভিন্ন অস্থির সন্ধানরেখাগুলি কর্ত্তিত নাসাগুহার মধ্যে স্পষ্টভাবে দর্শনীয়।

নেত্রগুহার ভিতরে নয়টী বিবর আছে, যথা—মূলে দৃষ্টিনাড়ী রন্ধ্র; ইহার বহির্ভাগে পক্ষাস্তরাল ও হনুজাতুক খাত; অন্তঃসীমার

[৩৯ চিত্র—নাসাগুহা (বাম)]

বহিঃ প্রাচীরের দৃশ্য।

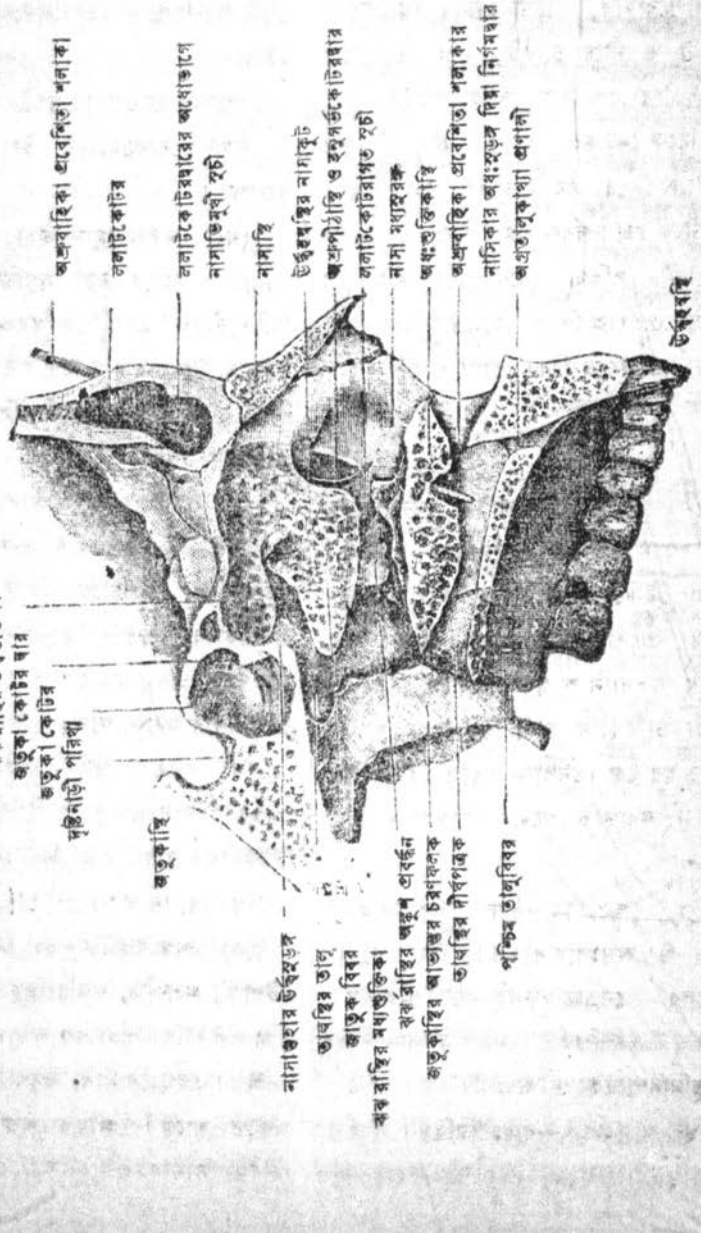

ঝর্ঝরকাস্থির সূক্ষ্ম বিবরদ্বয়; অন্তকোণে অশ্রুবাহিকা; ঊর্দ্ধ পরিধিতে অধিভ্রুব ও অধঃপরিধিতে নেত্রাধরীয় বিবর; বহিঃকোণে শঙ্খগণ্ডিকাখ্য রন্ধ্রমার্গ।

পেশী—প্রত্যেক নেত্রগুহার প্রাচীরে চারিদিকে সাতটী পেশী সংবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যে ছয়টী দ্বারা নেত্রগোলককে নানাদিকে ঘুরান ফিরান যায়—সপ্তমটী অশ্রুবিসর্জ্জন কার্য্যে সহায়তা করে। ইহাদের বিবরণ পরে বলা যাইবে।

নাসাগুহা।

নাসাগুহা দুইটী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান এবং শ্বাসবায়ু গ্রহণের দ্বারস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে পাতলা অস্থিময় প্রাচীর আছে। প্রধানতঃ গলবিবরের সহিতই ইহাদের সম্বন্ধ। চৌদ্দখানি অস্থিদ্বারা নাসাগুহা নির্ম্মিত, যথা—ঝর্ঝরক, জতুকা, অগ্রকপাল, ঊর্দ্ধহনুস্থি—এই তিনখানি করোটির অস্থি এবং অধোহনুস্থি ও গণ্ডাস্থিদ্বয় ব্যতীত মুখমণ্ডল নির্ম্মাপক অন্য এগার খানি অস্থি।

প্রত্যেক নাসাগুহার ছয়টী অংশ যথা—গুহাচ্ছদি, গুহাভূমি, অন্তঃপ্রাচীর, বহিঃপ্রাচীর, নাসাপুরোদ্বার, ও নাসাপশ্চিমদ্বার।

প্রত্যেক নাসাগুহার তিনটী করিয়া সুড়ঙ্গ আছে—ঊর্দ্ধসুড়ঙ্গ, মধ্যসুড়ঙ্গ এবং অধঃসুড়ঙ্গ। বহিঃপ্রাচীর বর্ণনা কালে ইহাদের বিষয় বলা যাইবে।

নাসাগুহাচ্ছদি (ছাদ)—ইহা অগ্রভাগে নাসাস্থিদ্বয় ও পুরঃকপালের অগ্রকণ্টক দ্বারা, মধ্যে ঝর্ঝরাস্থির চালনীপটল দ্বারা এবং পশ্চাতে জতূকাস্থি শরীরের পিণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে নাসাস্থি দুইটীর নিম্নে নাসানাড়ীদ্বয়ের এবং চালনীপটলস্থ ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়া গন্ধগ্রাহি নাড়ীর শাখাপ্রশাখা সমূহ অবস্থিত।

নাসাগুহাভূমি বা নাসাভূমি—ইহা ঈষৎ কোরোদর এবং সম্মুখে ঊর্দ্ধহনুস্থির তালুফলক ও পশ্চাতে তাল্বস্থির হ্রস্বপত্রক দ্বারা নির্ম্মিত। নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যভাগে সীরিকাস্থি মধ্যপ্রাচীরভূত হইয়া নাসাভূমিতে সংহিত হয়।

অন্তঃপ্রাচীর—ইহা উভয় নাসাভূমির মধ্যে একটী মাত্র। এই অংশ তির্য্যক্‌ভাবে সংহিত ঝর্ঝরাস্থির মধ্যফলক ও সীরিকাস্থির দ্বারা নির্ম্মিত, এজন্য ইহা প্রায়ই একদিকে আনত দেখা যায়। উক্ত অস্থিদ্বয় অগ্রভাগে ত্রিকোণ তরুণাস্থির সহিত সংহিত এবং পশ্চাতে জতূকাস্থির 'রসনিকা'র সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ভেদে অন্তঃপ্রাচীরের দুইটী পার্শ্ব। উভয় পার্শ্বে নাসাতালুকাখ্য নাড়ীদ্বয় ধারণের জন্য দুইটী খাত এবং নাড়ী ধমনী-প্রতান ধারণের জন্য বহু সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে।

বহিঃপ্রাচীর—প্রত্যেক নাসাগুহার বহিঃসীমায় একটী করিয়া পৃথক্ প্রাচীর আছে। এই বহিঃপ্রাচীর সম্মুখে ঊর্দ্ধহনুর নাসাকূট ও অশ্রুপীঠাস্থি দ্বারা; মধ্যে ঝর্ঝরকের পার্শ্বপিণ্ড ও শুক্তিকাস্থি দ্বারা; এবং পশ্চাতে তাল্বস্থির দীর্ঘপত্রক ও জতূকাস্থির চরণফলকের দ্বারা নির্ম্মিত।

শুক্তিকাপত্রকাকারে অবস্থিত তিনটী অস্থি বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, সেজন্য প্রত্যেক দিকের নাসাপথ তিনটী সুড়ঙ্গ বিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে—

(১) ঊর্দ্ধসুড়ঙ্গ—ঊর্দ্ধতম ও হ্রস্বতম। এই অংশ নাসাপথের পশ্চার্দ্ধমাত্রে বর্ত্তমান এবং ঋষ্যরাস্থির ঊর্দ্ধ ও মধ্য শুক্তিকাভাগের অন্তরালে অবস্থিত। ইহাতে তিনটী বিবর আছে, যথা—পশ্চাতে 'তালুজাতুক'—ইহা তদাখ্য নাড়ী ধমনী প্রবেশের জন্য; সম্মুখে 'ঋষ্যরকোটরদ্বার',—ইহা ঋষ্যরাস্থির পশ্চিম-কোটরের অনুবন্ধী; চূড়ায় 'জতূকাদ্বার'—ইহা জতূকাপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোটরের অনুবন্ধী। দারুণ পীনস রোগে এই সকল বিবরপথে পূয়াদি প্রবেশ করিয়া অস্থিগুলি জর্জ্জরিত হয় এবং মস্তিষ্কের পর্য্যন্ত বিকৃতি ঘটে।

(২) মধ্যসুড়ঙ্গ—ইহা ঋষ্যরাস্থির মধ্য-শুক্তিকা ও অধঃশুক্তিকাস্থির অন্তরালস্থ মধ্যমাকার সুড়ঙ্গ। ইহাতে ঊর্দ্ধদিকে একটী ছিদ্র দেখা যায়, উহা ঋষ্যরকোটরের দ্বারা ললাটকোটরের সহিত অনুবন্ধী। ঊর্দ্ধহনু-পিণ্ডস্থ অপর ছিদ্রটী ঊর্দ্ধহনুর হনুগর্ভকোটরের দ্বারস্বরূপ। নাসারোগে ললাটকোটর ও হনুগর্ভকোটর—উভয় কোটরের মধ্যে পূয়াদি সঞ্চিত হইতে পারে।

(৩) অধঃসুড়ঙ্গ—অধঃশুক্তিকাস্থির নিম্নস্থ এই দীর্ঘতম মার্গ নাসিকার বহিঃ-প্রাচীরের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অতিপ্রবৃত্ত অশ্রুর নাসাগুহায় প্রবেশের জন্য 'অশ্রুবাহিকা' প্রণালীর দ্বার থাকে।

নাসাপুরোদ্বার বা নাসাগুহার সম্মুখদ্বার—কতকটা ক্ষুদ্র তাম্বূলপত্রের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট। ইহা নাসাগুহাদ্বয়ের মধ্যস্থ ত্রিকোণ তরুণাস্থি ও মধ্য প্রাচীর নির্ম্মাপক অস্থিগুলির দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

নাসাপশ্চিমদ্বার—নাসাগুহাদ্বয়ের পশ্চাতের দ্বার গলবিবরের দিকে উন্মুক্ত ও প্রায় গোলাকার। ইহার পশ্চাতে ও ঊর্দ্ধসীমায় গলবিবরের আচ্ছাদন স্বরূপ পশ্চিম কপালের মূলপিণ্ড ও জতূকাশরীর, অধঃসীমায় তাবস্থির হ্রস্বপত্রকদ্বয় এবং উভয়পার্শ্বে জতূকাস্থির চরণদ্বয় অবস্থিত। ইহা সীরিকাস্থি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত।

সমগ্র করোটির ত্বাচ ভাগ।

ত্বকের নিম্নস্থ অস্থির অংশকে ত্বাচভাগ বলে। করোটির ও মুখমণ্ডলের সাতাশটি ত্বাচ ভাগ বিশেষভাবে দর্শনীয়, যথা—দুইটী ভ্রূতোরণিকা (ভ্রূদ্বয়ের নিম্নে), দুইটী গণ্ডকূট ও দুইটী গণ্ডচক্র, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটী গোস্তন-প্রবর্দ্ধন, মাথার পশ্চাতে দুইটী উত্তরতোরণিকা ও একটী পশ্চিমার্দ্ধ, দুইপার্শ্বে দুইটী পার্শ্বকুম্ভ ও তন্নিম্নে কাণের উপর দুইটী শঙ্খতোরণিকা, সম্মুখে দুইটী অগ্রকুম্ভ, নাসামূলে দুইটী নাসাস্থি, দুইটী নেত্রগহ্বরের পরিধিদ্বয়, অধোহনুর দুইদিকে দুইটী হনুকোণ ও মধ্যে অধঃস্থ ধারা এবং সম্মুখে একটী চিবুকপিণ্ড। ভবিষ্যতে বুঝিবার সুবিধার জন্য এই সকল অংশ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

"কীকসে যদি কার্কশ্যং তথাপ্যাদীয়তামিদম্।
জ্ঞানগঙ্গাম্বুসঙ্গত্যা দিব্যা তনুরতোঽতঃ ॥" *

অনুবাদ—এই অস্থিখণ্ড কর্কশ হইলেও সাদরে গ্রহণীয়। কারণ জ্ঞান গঙ্গাজল সম্পর্কে ইহা হইতে দিব্যতনু হইবে। অর্থাৎ—অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যেমন দিব্যতনু উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই অস্থিখণ্ডে সম্যক্ জ্ঞান হইলে শরীরের যাবতীয় অংশ সুখবোধ্য হইয়া থাকে।

নাড়ী-চক্র।

[লেখক—শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ।]

"তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ যাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ বামৌ
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥"

*　　*　　*　　*

বিকৃত কণ্ঠে, শিথিল উচ্চারণে,—শ্লোকটী আবৃত্তি করিতে করিতে, ডাক্তার বলিয়া ফেলিলেন—"কি ভ্রমাত্মক ধারণা! এখন বেশ বুঝা গেল ঋষিদের শারীর বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান একেবারেই ছিল না! নাভিদেশে কচ্ছপের মত যন্ত্র থাকা—অসম্ভব!

এইখানে ডাক্তারের একটু পরিচয় দিয়া রাখি। ইনি আমার পরম বন্ধুর পুত্র। মেডিকেল কলেজের এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের গৌরবোজ্জ্বল উপাধি লাভ করিয়া, দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ডাক্তারের মূর্ত্তিখানি বেশ একটু অনুকূল সৌম্য-স্নিগ্ধ গভীরতায় সুপ্রকাশ। তাঁহার "কাপ্তেন" বিশেষণটী আত্মীয় স্বজনের গর্ব্ব তৃপ্তির উপাদান।

ডাক্তার শুনিয়াছিলেন—বৈদ্যগণ নাড়ী দেখিয়া রোগ ধরিতে পারেন। তাঁহার নাড়ী বিজ্ঞান পড়িবার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। পক্ষকাল পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে তিনি একখানি মুদ্রিত "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথমেই নাভিদেশে কূর্ম্মের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়াই—নাড়ী-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহার ভক্তি চটিয়া যায়। যাহারা নিপুণ হস্তে শত শত শবদেহ ছেদন করিয়াছে—তাহারা নাভিদেশে কূর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে কেন? তাই ডাক্তারের বিশ্বাস হইয়াছিল—অনেক উচ্ছৃঙ্খল কল্পনা, অপ্রত্যাশিত প্রবল বাত্যার মত—ঋষি পরিষদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে "আয়ুর্ব্বেদের" প্রত্যক্ষ শারীর কলুষিত হইয়াছে। বৈদ্য চিকিৎসাও শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

---

* প্রত্যক্ষশরীর হইতে উদ্ধৃত।

ডাক্তার আমাকে "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" ফেরৎ দিতে আসিয়াছিলেন। যে পুস্তকে বহু শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর বুকে বসিয়া, সে পুস্তক তিনি পড়িতে পারিবেন না। আমার বৈঠকখানায় তখন অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তারের অন্ধ উগ্রতার সমালোচনায় আমি যেন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বঙ্গ-সাহিত্যে আমার পরমারাধ্য আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মুখে একটী গল্প শুনিয়াছিলাম—একটী নব্য বঙ্গ কামিনীর সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—সেজন্য তিনি "হিতোপদেশ" নামক গ্রন্থ কিনিয়াছিলেন। একদা তাঁহার এক সঙ্গিনী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি! তোমার সংস্কৃত শিক্ষা কতদূর হইল?" সুন্দরী উত্তর দিলেন—শিখিব বলিয়া বই পর্য্যন্ত কিনিয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকের প্রথম পাতাতেই দেখি—"কস্মিংশ্চিৎ বনে"র পরই "ভাসুরের" নাম—কাজেই পড়া হইল না।"

সহসা গল্পটী আমার মনে পড়িয়া গেল। প্রথমে "বড় ঠাকুরের" নাম দেখিয়া বিদুষীর সংস্কৃত শিক্ষা যেমন অগ্রসর হয় নাই, কূর্ম্মের কথায়—তেমনি ডাক্তারেরও বুঝি নাড়ী-বিজ্ঞান পাঠের প্রবৃত্তি নষ্ট হইয়াছে!

বহু নরনারায়ণের অতি-মানুষ প্রতিভা, যে বিজ্ঞানকে একদা সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল তাহার প্রতি এতদূর উপেক্ষা আমার সহ্য হইল না। আমি ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—অন্ধকার গর্ভের অন্ধ সরীসৃপ আপনার ললাটস্থিত "রত্নপ্রদীপের" মহিমা বুঝিতে পারে না। ডাক্তার! নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝিতে হইলে—আবার তোমাকে হিন্দু হইতে হইবে। কৌরব লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর বসনের মত—হিন্দুশাস্ত্রের স্তরে স্তরে প্রহেলিকার জটিল জাল জড়াইয়া আছে,—দাম্ভিক দুঃশাসনের শক্তিতে তাহার স্বরূপ মোচন—অসাধ্য ব্যাপার।

অলস মন্থর পদক্ষেপে—লজ্জা-ললিত মুখে গোধূলির হিরণ্যদীপ্তি মাখিয়া, ডাক্তার চলিয়া গেলেন। তাঁহার পদশব্দ অস্ফুট মর্ম্মযাতনার হাহাকারের মত মুহূর্ত্তকাল ঘরের মধ্যে সুব্যক্ত হইয়া রহিল। আমি "নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা" তুলিয়া রাখিলাম।

তন্ত্রের সিদ্ধান্ত।

যে শ্লোকটী লইয়া সেদিন ডাক্তার আমার আয়ুর্ব্বেদের উপর শ্লেষময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—বাস্তবিক সে শ্লোকটী আকাশের মত বিরাট, তরুচ্ছায়ার মত রহস্যময়—জল-কল্লোলের মত দুর্ব্বোধ্য। উহা তন্ত্রের শ্লোক—শঙ্কর সেনের লিপি কৌশলে "নাড়ী প্রকাশে" উদ্ধৃত হইয়াছে। যিনি "তান্ত্রিক" নহেন,—তিনি নাড়ী বিজ্ঞানের রহস্য কখনই বুঝিতে পারিবেন না।

ইতোমধ্যে—সুহৃদ্বর সত্যচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য "অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে" গিয়াছিলাম। তখন কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয়—ছাত্রগণকে নাড়ী বিজ্ঞানের উপদেশ দিতে ছিলেন। সে উপদেশ শুনিবার আমার সময় ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়—নাড়ী-বিজ্ঞান বুঝাইবার পূর্ব্বে—ছাত্রগণকে তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু

উপদেশ দিলে ভাল হয়। আশা করি—অধ্যাপকগণ এ অধমের কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তন্ত্রের "নাড়ীচক্র" লইয়াই আলোচনা করিব।

তন্ত্র—অনেকটা বিজ্ঞান, অনেকটা ইতিহাস। বিশ্বকাহিনী ও মানব কাহিনীর বিচিত্র সংমিশ্রণে তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত—দেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সমতা সাধন। বাহিরে যে লীলা হইতেছে—জীবের দেহের ভিতরও অহরহঃ সেই লীলা চলিতেছে। যিনি এই ভিতর-বাহির এক করিতে পারেন—তিনিই "যোগী"। তন্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে
তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"

চলিত কথায় ইহার অর্থ—"যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই পাবে দেহ ভাণ্ডে"। সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত দেহতত্ত্বের এই সমঞ্জসীকরণ—তন্ত্রের অপূর্ব্ব শক্তি। তন্ত্রের মতে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণজ্ঞান একমাত্র দেহ হইতেই লাভ করা যায়। যিনি বৈদ্য—তিনি তান্ত্রিক, তিনি মহাযোগী। দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইলে—তন্ত্রের সাধনা করিতে হইবে।

তন্ত্রের কথাতেই আমি "নাড়ীচক্র" বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার অক্ষম হস্তের রচনা হয় তো পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া পড়িবে। পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্বাস-সংক্রমণ।

"উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন" বহির্জগতের এই দুই গতি। মানবদেহেও—শ্বাসের 'ইড়া' ও 'পিঙ্গলা' নামে দুইটী গতি আছে। উত্তরায়ণে—ধরিত্রীর আগ্নেয় শক্তি বৃদ্ধি হয়,—সূর্য্যের উত্তাপদায়িনী শক্তি প্রবল হইয়া পড়ে; দক্ষিণায়নে—পোষক শক্তি বা চন্দ্রের শৈত্যগুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চন্দ্রের এই শৈত্যগুণ সূর্য্যের অমা-কলা হইতে উৎপন্ন; শ্রুতির কথাই ইহার প্রমাণ;—

"রবিমধ্যে স্থিতঃ সোমঃ সোমমধ্যে হুতাশনঃ"।
* * * * *
অমানাম কলাহ্যেষা সূর্য্যস্যামৃতরূপিণী।
অমাখ্যাবিকৃতিশ্চন্দ্রঃ চন্দ্রস্য বিকৃতির্জগৎ॥

অমা—সূর্য্যের অমৃতরূপিণী কলা। অমার বিকৃতি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্রের বিকৃতি হইতে জগতের উৎপত্তি। যে তিথিতে সূর্য্য চন্দ্রের সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই তিথি "অমাবস্যা" নামে পরিচিত।

একটী বৎসরের মধ্যে যেমন "উত্তরায়ণ" ও "দক্ষিণায়ন"—একটী দিনের মধ্যেও তেমনি "দিবা" ও "রাত্রি"। উত্তরায়ণ—দিবা, দক্ষিণায়ন—রাত্রি। উত্তরায়ণে—বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা—এই তিন ঋতু; দিবারও তেমনি প্রাতঃকালে বসন্ত, মধ্যাহ্নে গ্রীষ্ম এবং অপরাহ্নে বর্ষা। দক্ষিণায়নেও—শরৎ, হেমন্ত ও শীত এই তিনটী ঋতু; তদ্রূপ রাত্রিরও তিনটী ঋতু, যথা—রাত্রির প্রথম ভাগের নাম শরৎ, মধ্যম অবস্থার নাম হেমন্ত ও শেষ ভাগের নাম শীত।

মানবদেহ যে সময় দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহিতে থাকে—তাহাকে সূর্য্যনাড়ী বা পিঙ্গলা বলে। আবার যখন বাম নাসিকায় শ্বাস বহে—তখন তাহার নাম চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ ইড়া। বহির্জগতে—উত্তরায়ণে অথবা দিবা-

ভাগে সূর্য্যের আদান শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; দেহ-জগতেও—দক্ষিণ নাসায় শ্বাস-সংক্রমণের সময়—দেহের আগ্নেয় শক্তি বাড়িয়া থাকে। দক্ষিণায়নে বা রাত্রিকালে—চন্দ্রের শৈত্যগুণ (পোষক শক্তি) বর্দ্ধিত হয়; বাম-নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময়—শরীরেও পোষণ শক্তি বাড়ে।

যে সময় দুই নাসিকাতেই শ্বাস-প্রবাহ সমান থাকে—তন্ত্র মতে তাহার নাম সুষুম্না নাড়ী। ইংরাজী ভাষায় "নাড়ী" অর্থে যাহা বুঝায়, হিন্দু মতে নাড়ী বলিলে তাহা বুঝায় না। ইংরাজী ভাষায় যাহার নাম Aorta—আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার নাম মহাস্রোত। তন্ত্র সুষুম্নাকেই সর্ব্বপ্রধান নাড়ী বলেন। দেহের মধ্যস্থল মেরুদণ্ড—সুষুম্নার আশ্রয় স্থান। ঈড়া নাম্নী নাড়ী—এই সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বের Sympathetic nerve দিয়া বাম নাসিকায় বিকসিতা; পিঙ্গলা নাড়ী—দেহের বাম মধ্যস্থ Sympathetic nerve দিয়া সুষুম্নার প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় প্রকাশিতা।

চিকিৎসকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন—শরীরের দক্ষিণ অঙ্গে পক্ষাঘাত হইলে মস্তিষ্কের বাম দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে—বামদিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে—দক্ষিণ দিকে রোগ নিরূপিত হইয়া থাকে। যে দিকের অঙ্গ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়, সে দিকের অঙ্গ, অন্য দিকের অঙ্গের চেয়ে শীতল স্পর্শ হয়—সে অঙ্গ শীর্ণ হইয়াও পড়ে। এই যে শৈত্য ও কৃশতা—তাহা কেবল পোষণ শক্তির অভাবেই ঘটিয়া থাকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে বা কশেরুকা মজ্জায় যেরূপ দোষ হয়—Sympathetic nerve এও ঠিক সেই দোষ ঘটে। শোণিতবহা শিরার অধিক প্রসারণের জন্য সেই শিরাজাল হইতে রক্তের উত্তাপ অধিক পরিমাণেই নির্গত হইয়া যায়—সুতরাং পক্ষাঘাত আক্রান্ত অঙ্গ—অপেক্ষাকৃত শীতল স্পর্শ হয়।

আমাদের নাসিকার সম্মুখে যেমন দুইটী ছিদ্র আছে—নাসিকাগর্ভের অভ্যন্তরে—পশ্চাৎ দিকেও তেমনি দুইটী ছিদ্র আছে। বায়ু সম্মুখের ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া পশ্চাতের ছিদ্র দিয়া বায়ুনলীতে গমন করে। কখনও এক ঘণ্টা, কখনও বা দুই ঘণ্টা অন্তর, নাসিকাভ্যন্তরের পশ্চাৎ দিকের ছিদ্র—বন্ধ হইয়া যায়। এ ব্যাপার—পর্য্যায়ক্রমে ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একবার বাম নাসিকায়, একবার দক্ষিণ নাসিকায়, পশ্চাৎ ভাগের ছিদ্র আবদ্ধ হইয়া থাকে। যে দিকের ছিদ্র বন্ধ হয়—সেই দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ফুলিয়া উঠে এবং তাহা উষ্ণস্পর্শ বলিয়া মনে হয়। যে দিকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্ফীত হয়, তাহার বিপরীত দিক দিয়াই শ্বাস বহিয়া থাকে।

যদি কোন কারণে বাম নাসিকা বহুদিন আবদ্ধ থাকে—তাহা হইলে দেহে পৈত্তিক রোগের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে, আবার দক্ষিণ নাসিকা বেশী দিন বন্ধ থাকিলে—শরীরে কফজ রোগ জন্মে।

বামপার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলে দক্ষিণ নাসিকায়, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিলে বাম নাসিকায়,—শ্বাসের সঞ্চরণ ঘটিতে দেখা যায়। এই শ্বাস-সংক্রমণের ব্যাপার যিনি বেশী জানিতে চাহেন,—

তিনি তন্ত্র পাঠ করিবেন। প্রবন্ধের অতি বিস্তার আশঙ্কায়—আমি এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম। তন্ত্র বলেন—এইরূপ শ্বাস সংক্রমণের নির্দ্দেশ দ্বারা—শরীরের শুভাশুভ, ভাগের উন্নতি অবনতি, জীবনের বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ—প্রভৃতি বহু বিষয় অবধারিত হইতে পারে।

প্রধান নাড়ীগণের নাম।

শরীরের প্রধান নাড়ী তিনটী;—ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই তিনটীর মধ্যে আবার সুষুম্নাই সর্ব্বপ্রধান। কেননা—দেহের সমস্ত নাড়ীই এই সুষুম্না হইতে জাত এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মশীল। সুষুম্নার অবস্থান ঈড়া পিঙ্গলার মধ্যে—এই জন্যই তান্ত্রিক মতে সুষুম্নার আর একটী বিশেষণ "ত্রিগুণাত্মিকা"। সুষুম্নার যে শক্তি রজঃগুণ স্বরূপিণী—তাহার নাম "বজ্রা," যে শক্তি সত্ত্বগুণসম্পন্না তাহার নাম "চিত্রিণী," যে শক্তি তমোময়ী—তাহার নাম "ব্রহ্মনাড়ী"। যথা;—

রজোগুণা চ বজ্রাখ্যা চিত্রিণী সত্ত্বসংযুতা।
তমোগুণা ব্রহ্মনাড়ী কার্য্যভেদ ক্রমেণ চ॥

ঈড়া নাড়ী—বাম মুষ্ক (Prostatic Plexus) হইতে সুষুম্নাকে অবলম্বন করিয়া—ধনুর মত বাঁকিয়া—হৃদয়ে আসে, অঙ্গের বামভাগস্থিত যন্ত্র সমূহের ভিতর দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় গমন করে। পিঙ্গলা দক্ষিণ মুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া—বক্রভাবে বাম নাসিকায় উপস্থিত হয়। বাম নাসিকার শ্বাস সঞ্চরণের কাল "ঈড়া-প্রবাহ' নামে এবং দক্ষিণ নাসিকার শ্বাস বহন কাল "পিঙ্গলা-প্রবাহ" নামে অভিহিত। যখন উভয় নাসিকায় সমানভাবে শ্বাস বহে—তাহার নাম—"সুষুম্না" প্রবাহ। এই সুষুম্না প্রবাহের সময় "হ" (চন্দ্র নাড়ী) এবং "ঠ" (সূর্য্য নাড়ী) এক হইয়া যায়। হঠযোগিগণ এই রহস্য অবগত আছেন। পাঠকগণ! "প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

মানবের বাম নেত্রে "গান্ধারী" নাড়ী, দক্ষিণ নেত্রে "হস্তী জিহ্বা" নাড়ী, বাম কর্ণে "যশস্বিনী" নাড়ী এবং দক্ষিণ কর্ণে "পূষা" নাড়ী অবস্থিত। জিহ্বাস্থিত নাড়ীর নাম—"অলম্বুষা"—ইহার কার্য্য আস্বাদন করা। জননেন্দ্রিয়স্থিত নাড়ী "কুহু" নামে এবং মস্তক স্থিত নাড়ী "শঙ্খিনী" নামে অভিহিত। *

প্রধান নাড়ীগুলির ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শরীরস্থ সমস্ত নাড়ীর সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি! তন্ত্র স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে—এই সকল নাড়ীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। পারি তো সে পরিচয় পরে দিব।

নাড়ীর উৎপত্তি স্থান।

তন্ত্রের মতে সমস্ত নাড়ীর উৎপত্তি স্থান "নাভি"। "নাভি কন্দ নিবদ্ধা স্তাস্তির্য্য গূর্দ্ধ্বমধঃস্থিতাঃ।" এই স্থলেই প্রাচ্য মতের সহিত পাশ্চাত্য মতের বিরোধ। এই নাভি কন্দই "কূর্ম্ম" নামে অভিহিত হইয়াছে। য়ুরোপের বিজ্ঞান কূর্ম্মের অস্তিত্ব একেবারেই

* গান্ধারী—Left Optic Nerve.
হস্তি জিহ্বা—Right Optic Nerve.
পূষা—Right Auditory.
যশস্বিনী—Left Auditory.
অলম্বুষা—Gustatory nerve.
কুহু—Pudic nerve.

স্বীকার করিবে না। কিন্তু এই 'নাভি' বা 'কূর্ম্মের' কথা একটু তলাইয়া বুঝিলেই—সমস্ত গোল মিটিয়া যায়। এখন সেই চেষ্টাই আমরা করিব। এখানেও আমাদিগকে তন্ত্রের মত অনুসরণ করিতে হইবে।

শিব সংহিতায় দেখিতে পাই গুহ্যদ্বারের দুই অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে এবং মেঢ্র স্থানের দুই অঙ্গুলি নিম্নে—চারি অঙ্গুলি পরিমিত বিস্তৃত স্থানে "মূলাধার পদ্ম" বিরাজিত। এই পদ্মের কর্ণিকারের মধ্যে—"ত্রিকোণ মণ্ডল" অবস্থিত। যোগিগণ ইহাকে "যোনি মণ্ডল" বলিয়া থাকেন। "যোনি মণ্ডলে"র মধ্যস্থলে বিদ্যুৎলতার ন্যায় আকার সম্পন্ন সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা কুটিলা কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মপথ সংরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ত্রিকোণ মণ্ডল হইতেই ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার উৎপত্তি। মূলাধার পদ্ম হইতে আরও বহু নাড়ী উত্থিত হইয়া জিহ্বা, মেঢ্র, বৃষণ, পাদাঙ্গুষ্ঠ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, পায়ু, কুক্ষি প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গমন পূর্ব্বক স্বস্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার নিজ নিজ জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অন্যা যাস্তপরা নাড্যা মূলাধারাৎ সমুত্থিতাং।
রসনা মেঢ্র বৃষণ পাদাঙ্গুষ্ঠঞ্চ নাসিকাং।
কক্ষ নেত্রাঙ্গুষ্ঠ কর্ণং সর্ব্বাঙ্গং পায়ু কুক্ষিকং।
লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবাঃ॥

—মূলাধার চক্রবর্ণনং।

ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে—শরীরের নাড়ী সমূহ মূলাধার পদ্মের মধ্যস্থিত কুলকুণ্ডলিনী হইতে উৎপন্ন, অতএব উদরপ্রাচীরস্থিত চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি—কখনই নাড়ীগণের জন্মভূমি নহে।

সংস্কৃত ভাষায় যে কোন পদার্থের মধ্যস্থলকেই "নাভি" বলে। যথা,—চাকার মধ্যস্থলের নাম "চক্রনাভি"। সূর্য্য—সৌর জগতের মধ্যস্থলে আছেন, তাই তাঁহার নাম "জগন্নাভি"। চুম্বকের দুই সীমায় লৌহাকর্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু তাহার ঠিক মধ্যস্থলে সে শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ শক্তিবিহীন মধ্যস্থল না থাকিলে,—চুম্বকের উভয় প্রান্ত লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারিত না। এই দৃষ্টান্ত জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। স্থির মধ্যস্থল না পাইলে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে পারে না। মানব দেহেও—চুম্বকের ন্যায় মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়া জীবনীশক্তি কার্য্য করিয়া থাকে। স্থিরমধ্যস্থল না থাকিলে—জীবদেহেও জীবনী শক্তির বিকাশ ঘটিত না। এই স্থির মধ্যস্থলের নাম—"অনন্ত" "বা বাসুকী"।

এইবার আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব মানবদেহের সেই স্থির মধ্যস্থল কোথায়?

যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্র লইয়া অল্প বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই জানেন তুলা রাশি—রাশিচক্রের ঠিক মধ্য স্থলে অবস্থিত। বিরাট দেহের যেমন দ্বাদশ রাশি, মানব দেহেও সেইরূপ দ্বাদশ রাশি আছে, যথা—

মেষো শিরো বৃষো বক্ত্রং মিথুনং বাহুযুগ্মকং।
কর্কটো হৃদয়ঞ্চৈব সিংহশ্চোদর মেব চ।
কন্যা কটী তুলা বস্তি বৃশ্চিকো গুহ্যমেবচ।
ধনু উরা মৃগো জানু কুম্ভো জঙ্ঘে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মীনো পাদদ্বয়ঞ্চৈব কালাঙ্গে নিয়তং ক্রমাৎ॥

অর্থাৎ মানবের মস্তক—মেষ রাশি,

মুখ—বৃষ রাশি, বাহুদ্বয়—মিথুন রাশি; হৃদয়—কর্কট রাশি, * উদর—সিংহ রাশি, (১) কটী—কন্যা রাশি; বস্তি—তুলা রাশি; (২) গুহ্যদেশ—বৃশ্চিক রাশি; উরুদ্বয়—ধনু রাশি হাটু—মকর রাশি, জঙ্ঘা—কুম্ভ রাশি, পাদদ্বয়—মীন রাশি। মানব দেহ এই দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত।

তুলা রাশি যেমন রাশিচক্রের মধ্যস্থল, সেইরূপদেহের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে ত্রিকাস্থি (Sacrum) আছে—সেই স্থান দেহের মধ্যস্থল। বস্তি ও লিঙ্গমূল সম্মুখদিকে, ত্রিকাস্থি পশ্চাৎদিকে— এই অংশের নামই 'নাভি'।

তান্ত্রিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি—মানব দেহে চতুর্দ্দশ ভুবন আবিষ্কার করিয়াছিল। শরীরকে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিভক্ত করিলে—ভূঃ,ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত স্বর্গ এবং অতল বিতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবনের ত্রিকাস্থি যুক্ত স্থানই দেহের মধ্যস্থল বুঝায়।

তন্ত্র শাস্ত্রে আলোচনায় আরও জানিতে পারা যায়—

মহাশক্তি কুণ্ডলিনী নাড়ী স্থাহি স্বরূপিনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশশ্চাধোগতাস্তথা।
তির্য্যগ্ গতে তথা নাড্যো চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যায়া

অহি স্বরূপিনী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী হইতে চতুর্বিংশতি সংখ্যক প্রধান নাড়ী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটী নাড়ী ঊর্দ্ধ গামিনী, দশটী অধোগামিনী, বামে দুইটী দক্ষিণে দুইটী—এই পাঁচটী তির্য্যক গামিনী।

এইবার সুশ্রুতসংহিতার সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া দেখা যাউক। শারীর স্থানের নবম অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিতেছেন—"চতুর্বিংশতি ধমন্যো নাভি প্রভবা অভিহিতাঃ। তাসাং তু নাভি প্রভবানাং ধমনী নাং মূর্দ্ধগা দশ দশশ্চাধোগামিন্যঃ চতস্রস্তির্য্যগ্গাঃ"। সুতরাং তন্ত্রেও সুশ্রুতে কোন মতদ্বৈধ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না: "শিব স্বরোদয়" নামক আর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে যথা;—

নাড়ীস্থা কুণ্ডলি শক্তি র্ভুজঙ্গাকার শায়িনী।
ততো দশোর্দ্ধগা নাড্যো দশাধ; গা প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
দ্বে দ্বে তির্য্যগ্ গতে নাভৌ চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যয়া॥

নাভিস্থিত সর্পাকারশায়িনী কুণ্ডলিনীশক্তি হইতে ১০টী ঊর্দ্ধগামিনী, ১০টী অধোগামিনী, এবং ৪টী তির্য্যগ্ গত—এই ২৪টী নাড়ী বহির্গত হইয়াছে। এই মূলাধারস্থ ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলেরই নাম "কূর্ম্ম"। ভগবান্ দত্তাত্রেয় রূপকছলে এই কূর্ম্মের কথাই উত্থাপন করিয়াছেন—

তির্য্যক্ কূর্ম্মো দেহিনাং নাভিদেশে
বামে বক্ত্রং তস্য পুচ্ছঞ্চ মাম্যে।
ঊর্দ্ধে ভাগে হস্ত পাদৌ চ যাম্যৌ
তস্যাধস্তাৎ সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ॥
বক্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়ং তথা।
পঞ্চ পঞ্চ করে পাদে বাম দক্ষিণ ভাগায়াঃ॥

দেহিগণের নাভিদেশে তির্য্যগ্ ভাবে একটী কূর্ম্ম আছে। তাহার মুখ নাভির বামদিকে, এবং পুচ্ছ দক্ষিণ দিকে। বাম হস্ত ও বাম পদ—ঊর্দ্ধভাগে, দক্ষিণ হস্ত ও দক্ষিণ পদ—অধোভাগে। উহার মুখে ২টী নাড়ী, পুচ্ছদেশে ২টী নাড়ী—পদদ্বয়ে ও হস্তদ্বয়ে পাঁচটী

* হৃদয় (মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যন্ত্রের ক্রিয়াস্থান।
(১) উদর (সূর্য্যের গ্রহ)।
(২) বস্তি (এই স্থানের পশ্চাতে ত্রিকাস্থি)।

পাঁচটী করিয়া ২০টী নাড়ী, সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৪টি নাড়ী আছে।

তন্ত্র স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"ত্রিকোণং যোনিমণ্ডলং কূর্ম্মবিত্যভিধিয়তে।" ত্রিকোণ যোনিমণ্ডলের নামই কূর্ম্ম। সেই কূর্ম্ম হইতে ২৪টী ধমনীর উৎপত্তি।

মর্ম্ম নির্দ্দেশ অধ্যায়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন—পক্কাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে—সমস্ত শিরা-জালের উৎপত্তিস্থান নাভি নামক মর্ম্ম অবস্থিত; এই মর্ম্ম আহত বা আঘাত প্রাপ্ত হইলে মানবের সদ্যই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এই সকল প্রমাণের দ্বারা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,—নাড়ী বিজ্ঞানে যে নাভিকে নাড়ী সমূহের উৎপত্তি স্থান বলা হইয়াছে, সে নাভি উদরপ্রাচীরস্থিত চর্ম্ম নির্ম্মিত নাভি নহে। অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজনে—ডাক্তারগণ অনেক সময় চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি ছেদন করিয়া থাকেন,—তাহাতে রোগির মৃত্যু ঘটে না। সুতরাং সুশ্রুতোক্ত নাভি মর্ম্ম ও চর্ম্মনির্ম্মিত নাভি—এক হইতে পারে না। উদরাভ্যন্তরস্থিত আমাশয় ও পক্কাশয়—যেস্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রসবহা শিরা উৎপন্ন হইয়াছে,—সেই স্থানের নামই "নাভি"। সেই নাভি মর্ম্ম আহত হইলে মানুষের সদ্যই জীবনান্ত ঘটে।

তন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় শাস্ত্রই "নাভিকে" একবাক্যে প্রাণের আধার বলিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। ভ্রূণের দেহ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে—জননীর গর্ভস্থিত অণ্ডের (ovum) মধ্যস্থল হইতে জীবনীশক্তির ক্রিয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে মস্তিষ্ক, হাত, পা প্রভৃতি ক্রমশঃ গঠিত হইয়া থাকে। অতএব দেহের 'নাভি' অর্থাৎ মধ্যস্থল—প্রাণ বা জীবনী শক্তির প্রধান স্থান। নাভিস্থ প্রাণই মস্তিষ্ক ও কশেরুকা মজ্জায় (Spinal cord) সৃষ্টি করে। এই জীবনীশক্তিকে—এই প্রাণকে—উপনিষৎ "অণোরণীয়ান্ মহতে মহীয়ান্" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই জীবনীশক্তি জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত—সমভাবে বিদ্যমান থাকে।*

মানব দেহের প্রত্যেক জীবাণু—দ্বীরেপ মত শরীরের রসে ভাসমান। তাহারা আকর্ষণী-শক্তির দ্বারা রস হইতে আবশ্যক পদার্থ কেন্দ্রের দিকে টানিয়া লয়, অনাবশ্যক পদার্থ কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে বাহির করিয়া দেয়। এই আকর্ষণী শক্তির নাম "প্রাণ" বিকর্ষণী শক্তির নাম "অপান"। এই উভয় শক্তি জীবাণুর মধ্যস্থলকে অবলম্বন করিয়াই কার্য্য করিয়া থাকে। স্থূল দৃষ্টিতে এই মধ্যস্থল চুম্বকের মধ্যস্থলের ন্যায় ক্রিয়াহীন। জীবাণুর Nucleus, চুম্বকের মধ্যস্থান, মানব দেহের মধ্যস্থল—এই তিনটী এক জাতীয় কেন্দ্র—ইহার নামই নাভি। বিজ্ঞান যাহাকে

---

* ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পর যোগ রাখিবার জন্য বহির্জগতে যখন টেলিগ্রাফের তার পাতা হয়, তদ্রূপ আমাদের জীবনীশক্তি প্রাণের নাভি অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থল হইতে Sympathetic ধমনীমণ্ডল সমস্ত শিরাজালের প্রাচীরে প্রাচীরে বর্ত্তমান থাকিয়া দেহকে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ভ্রূণের মধ্যস্থল হইতে Amnion Choron এবং Allunlois অঙ্কুরিত হইয়া ফুল হয় Umbilicul Vesicaleএর সহিত ভ্রূণের ভ্রূণপিণ্ডের সম্বন্ধ ও উহার দেহের মধ্যদেশ হইতে প্রথম পরিলক্ষিত হয়।

ডাঃ ৺হেমচন্দ্র সেন, এম্ ডি।

Centripetal force বলে—তন্ত্র মতে তাহাই "প্রাণ", বিজ্ঞানের Centrifugal force, তন্ত্রের "অপান"—এই প্রাণ ও অপানের কার্য্য পরস্পরকে আকর্ষণ করা। ইহারা দেহের মধ্যস্থল বা নাভিদেশে নিবদ্ধ। তন্ত্র ইহাদের প্রকৃতির একটী সুন্দর উপমা লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন—

"অপানঃ কর্ষতি প্রাণঃ প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনঃ গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ॥

যে স্থির শক্তির প্রভাবে প্রাণ ও অপান কার্য্য করিতে সক্ষম হয়—সেই শক্তিই তন্ত্রের সুষুম্না নাড়ী। প্রাণ ও অপান, ঈড়া ও পিঙ্গলা—যে স্থানে মিলিত হয়, সেই স্থানের নাম "সুষুপ্তা"। ইহার ইংরাজী নাম—Neutral.

শিব স্বরোদয় গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—"নাভিকন্দ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় ৭২০০০ সহস্র ধমনী বহির্গত হইয়াছে।"

মানুষের শরীরে যত শক্তি কার্য্য করে,—সেই সকল শক্তি যে যে স্থান হইতে বহির্গত হয়,—বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা আবার নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে। তন্ত্রও বলিয়াছেন—"লব্ধা তা বৈ নিবর্ত্তন্তে যথাদেশ সমুদ্ভবাঃ।"

মূলাধারে তু যা শক্তির্ভূজগাকার রূপিনী।
তদ্‌ভ্রমাবর্ত্তবা তোয়ং প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

মূলাধারে যে ভুজঙ্গরূপিনী মহাশক্তি আছেন, তাহারই আবর্ত্তে শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে।—এই মহাশক্তি নিদ্রিতা—অর্থাৎ এই স্থানে চুম্বক-কেন্দ্রের মত কোন শক্তির চাঞ্চল্যই * পরিলক্ষিত হয় না। সমস্ত শক্তিই এখানে সুষুপ্ত (১) তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—মুখে নিবেশ্য সা পুচ্ছং সুষুম্না বিবরে স্থিতা। সুপ্তা নাগোপমা হেষা—" কূর্ম্ম হস্ত, পদ, মুখ প্রভৃতি প্রত্যঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে, প্রয়োজন মত শক্তি-বলে—আবার প্রত্যঙ্গ গুলির প্রসারিতও করে,—মূলাধারে কূর্ম্মের এই ধর্ম্ম নিরীক্ষণ করিয়াই—তান্ত্রিকগণ ইহাকে কূর্ম্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যেমন "নাভিকে" সমস্ত ধমনীর উৎপত্তি স্থান বলিয়াছেন, তেমনি সমস্ত শিরারও উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্তকেও অমূলক বলা চলে না। কথাটা একটু ধীরভাবে আলোচনা করা যাউক;—

ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইলে তাহার সারাংশের নাম—"রস"। পাশ্চাত্য মতে এই রসের নাম—chyle. এই রস যকৃৎ ও প্লীহায় গিয়া রক্তে পরিণত হইয়া থাকে। সমান বায়ু কর্ত্তৃক ইহা হৃদয়ে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে শক্তি solarplexus এ কার্য্য করে—তাহাই সমান বায়ু। এই বায়ুর কার্য্য—অন্ন পরিপাক করা। জীবনীশক্তি প্রভাবে—মানবের আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে—রস দুইটী মার্গ দিয়া হৃদয়ে গিয়া হৃদয়ে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহার দ্বারাই শরীর পোষণ হইয়া থাকে। দুগ্ধের মত শ্বেত বর্ণের রস—অসংখ্য সূক্ষ্ম শিরা (Lactial) দিয়া, দেহের বামদিকস্থ 'রস বহা'র (Thorucic duct) সাহায্যে বক্ষঃপ্রদেশের ভিতরে শোণিতের সহিত মিশিয়া—হৃদয়ে উপস্থিত হয়। ভুক্ত বিপাকের সারাংশের কিয়দংশ আমাশয় ও পক্কাশয় হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

* Vibrition. (১) Latent.

শিরা দিয়া—"মহাশিরা"য় (Portal vein) প্রবিষ্ট হয়। ইহাই তন্ত্রমতে রস প্রবাহের "দাক্ষিনী"। মহাশিরা হইতে রস যকৃতে গমন করে, তথায় বিশুদ্ধ হইয়া হৃদয়ে চলিয়া যায়। ইহার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে—আর্য্য বিজ্ঞানের মতে রস আমাশয় ও পক্বাশয় হইতে হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই উভয় আশয়ের প্রাচীরে যে সকল "স্রোতাগ্র" (Luctial ও Portal vein এর সূক্ষ্মাগ্রে) আছে, তাহারাই রস ও রক্ত বহা শিরার জন্মভূমি। তাই সুশ্রুত বলিয়াছেন,—"তাসাং (শিরাণাং) নাভিমূলং" নাভিই শিরাগণের মূল। নাভি হইতেই শিরাজাল ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া—সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ নাভি চর্ম্ম-নাভি নহে। এ নাভি প্রাণের আধার। শিরা, ধমনী ও প্রাণের সহিত চর্ম্ম-নাভির কোন সম্বন্ধই নাই। তন্ত্রের মূলাধার চক্রের কুণ্ডলিনী,—আয়ুর্ব্বেদের নাভিকন্দ—একই পদার্থ। ডাক্তারী বিজ্ঞানের Solur plexusএর ক্রিয়, আয়ুর্ব্বেদের নাভিকন্দের কার্য্য, তন্ত্রের কুণ্ডলিনী প্রভাব—তিনই সমান এই কুণ্ডলিনীর প্রভাব বুঝাইবার জন্যই তন্ত্র বলিয়াছেন,—

নাভিস্থঃ প্রাণ-পবনঃ স্পৃষ্ট্বা হৃদয়কমলান্তরং।
কণ্ঠাদ্বহির্বিনির্য্যাতি পা তুং বিষ্ণু পদামৃতং॥
পীত্বা বাষ্বর পীযূষং পুনরায়াতি বেগতঃ।
প্রীনয়ন্ দেহ মখিলং জীবয়ন্ জঠরানলং।

নাভিস্থিত প্রাণবায়ু হৃদ্‌কমলান্তর (Chese) স্পর্শ করিয়া বিষ্ণু পদামৃত (বাহ্য বায়ু) পান করিবার জন্য কণ্ঠ হইতে বহির্গত হয় এবং অম্বর পীযূষ পান করিয়া সমস্ত দেহের পরিতর্পণ ও জঠরানলের বর্দ্ধন করিয়া, আবার নাসারন্ধ্র দিয়া নিজস্থানে ফিরিয়া আসে।

এতক্ষণে বোধ হয় পাঠকগণও বুঝিতে পারিয়াছেন—প্রাচীন বৈদ্যগণ কেবল কল্পনা-বলেই বিজ্ঞানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলেন নাই। তাঁহারা শবচ্ছেদ করিয়া মানব দেহের প্রতি অণু পরমাণুর প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। শক্তিশালী অণুবীক্ষণে শরীরের যে রহস্য, আধুনিক বিজ্ঞান অদ্যাপিও আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যোগ-বিক্ষণে তাঁহাদের চক্ষে—তাহাও ধরা পড়িয়াছিল। আমাদের ক্ষুণ্ণ জ্ঞান—ঋষি-রচিত রূপক মায়া ভেদ করিতে জানে না, তাই পদে পদে প্রতারিত হয়।

পল্লীগ্রাম ও স্বাস্থ্যবিধান।

(শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

—::—

দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়। মনে হয়, বাঙ্গলাদেশ মানবশূন্য শ্মশানে পরিণত হইবে; ইহাই বুঝি তাহার নিয়তির বিধান! দেশে বার মাসই নানাপ্রকার সংক্রামক ও সংহারক ব্যাধি লাগিয়াই আছে। কোনপ্রকারেই বাঙ্গালাবাসী মানবের আর স্বস্তি নাই, সুখ নাই শান্তি নাই। বাঙ্গালা কি চিরদিনই এমনি অশান্তি উপভোগ করিয়া আসিয়াছে? না, ইতিহাস সে কথা বলে না। বরং আমরা তাহার বিপরীত প্রমাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখনকার এই প্লীহা-অগ্রমাংসে স্ফীতোদর কোটরগত চক্ষু কঙ্কালমূর্ত্তিগুলির পিতৃপিতামহগণের সম্বন্ধে যে গল্প শ্রবণ করা যায় অথবা ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বের যে সকল বাঙ্গালীর দেহ প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাতে বোধ হয় বাস্তবিকই বাঙ্গালা স্বাস্থ্য-সম্পদে এমন দীন হীন ছিল না; বরং সে বিষয়ে সে সৌভাগ্যবানই ছিল। আমরা বাঙ্গালাদেশ বলিতে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলিকেই বুঝি। এখন এই পল্লীগ্রাম ভাঙ্গিয়াই নগরের গৌরব বাড়িতেছে। দেশের যাহারা ধনী লোক, যাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আধুনিক সভ্যতায় দীক্ষিত লোক, তাঁহারা ম্যালেরিয়ার ভয়ে পিতৃপুরুষের স্মৃতিনিকেতন পরম রমণীয় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নগরে যাইয়া বাস করিতেছেন, বৃদ্ধা জননীর স্নেহ-শীতল শান্তি-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নব্যা বিলাসিনীর বিলাস-কাননে আত্মবিক্রয় করিতেছেন। বোধ হয় তাঁহারা ভাবিয়াছেন, পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিলেই, নীরোগ শরীরে চারিযুগ বাঁচিয়া থাকিয়া নিত্যনূতন অনাবশ্যকীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ কত অভাবের সৃষ্টিজনিত সুখ লাভ করা যাইবে। তাই তাঁহাদের প্রাণের মধ্যে পল্লীবিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে এই ধনী ও তথা কথিত জ্ঞানীদিগের বিদ্বেষ-জনিত অবহেলায় বাঙ্গালার পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংসপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বাস্তবিকই পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের এ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত বাবু চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন,—"হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগিরথীর পশ্চিমকুলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, বিনা চিকিৎসায় তথায় পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিতাম এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল কলেজের ছুটি হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না। ছুটি ফুরাইলে একমাস দেড়মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম—তাও একরকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রাম দেখিল না, সে গ্রাম্যসুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন

হইল। সে গ্রাম্যাই জীবন যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।" তারপর চন্দ্রবাবুই আবার লিখিয়াছেন,—"কৈকালা আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য—গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শতকরা ৭৫জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অল্পই আছে, পথের দু'ধারে কেবল কাঁতড়া পড়িয়া রহিয়াছে। * * * গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্যশূকরাদি হিংস্রজন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোণার কৈকালয়ে যাই নাই।" চন্দ্রনাথ বাবুর এই কথা, শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্ম্মভেদী স্বীকারোক্তি স্বরূপে গৃহীত হইবে। পল্লীবাসী চিরকাল মনে রাখিবে, চন্দ্রনাথ বাবুর মত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও স্বীয় জন্মভূমি কৈকালাকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত দেখিয়া কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন, ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ করিতে উপযুক্ত অস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হয়েন নাই। তাঁহার এ দৌর্ব্বল্যের জন্যই, তাহার "সোণার কৈকালা" শতকরা ৭৫জনকে হারাইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর এই ক্রটি স্বীকার—পরিণত বয়সে সোণার কৈকালার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, তাঁহার মহত্বেরই পরিচায়ক। পল্লীভূমির এমন কুলাঙ্গারও আছে, যিনি পল্লীমাতার সম্বন্ধ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন। নগরে নিতান্ত নগণ্য ভাবে জীবন যাপন করাও যেন পল্লীজননীর অনেক ভাগ্যবান পুত্রের অভাগা বংশধরের পক্ষে প্রার্থনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপে ম্যালেরিয়ার ভয়েও বটে এবং কতকটা অন্যান্য কারণেও বটে—ধনী ও তথাকথিত শিক্ষিতগণ পল্লীগ্রামগুলিকে পরিত্যাগ করায় পল্লীগ্রাম সকল সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীহীন হইয়া পরিয়াছে। যাহারা এই শ্রীহীন পল্লীগ্রামে বাস করে, তাহারাই কিন্তু দেশের সর্ব্বস্ব—দেশের সম্পদ—দেশের প্রাণ! তাহাদিগকে বাঁচাইতে না পারিলে দেশ রক্ষা হইবে না। দেহের বাহ্যিক সাজসজ্জা বাড়াইবার পূর্ব্বে,যাহাতে দেহের প্রাণটুকু রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালার এই প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে—পল্লীবাসী জনগণকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে পল্লীগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলে চলিবে না; বাঙ্গালার পল্লীগ্রামেই বাস করিতে হইবে, পল্লীবাসীর সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, পল্লীবাসী নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, আত্মরক্ষার উপযোগী জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে; তবে ত পল্লীবাসী বাঁচিবে—তবে ত দেশ রক্ষা হইবে!

স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া নীরোগ দেহে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, **পুষ্টিকর খাদ্য বিশুদ্ধ পানীয়, নির্ম্মল বায়ু ও শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার উপযোগী পরিচ্ছদাদির** প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এখন এই কয়টাতেই বঞ্চিত! সুতরাং আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ না হইবে কেন? ম্যালেরিয়ার ভয়ে জন্মভূমি পল্লীগ্রামকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে বাস করিলেও, আমরা পূর্ব্বকথিত আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির কয়টির সংস্থান করিতে পারি? এক শ্রেণীর লোক

আছে, যাহাদের সকল গুলিরই অভাব। দেশে হঠাৎ একটা কোন সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলে এই শ্রেণীর লোকেরাই অধিক মরে। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী—যাঁহারা মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু লাভের আশায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও আজকালের বাজারে স্বাস্থ্যের অনুকূল উপরোক্ত দ্রব্যের সকলগুলিই সংগ্রহ করিতে পারেন না। বরং তাঁহাদের অভাব কোন কোন বিষয়ে পল্লীবাসী অপেক্ষাও অধিক। আমরা একে একে আমাদের এই অভাবগুলির আলোচনা করিব।

১। **পুষ্টিকর খাদ্য**।—বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য চা'ল, দা'ল, মাছ, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল দ্রব্যের কতকগুলি দুর্ম্মূল্য এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য। বিশুদ্ধ ঘৃত দুগ্ধ অধিক মূল্য দিয়াও সংগ্রহ করা অসম্ভব। এখন ঘৃতের নামে নানাবিধ ঘৃত জন্তুর চর্ব্বি ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অনেক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ বাজারে প্রচলিত হইয়াছে। আমরা ঘৃতের লোভে, কতকটা মোহেও বটে, ঐ সকল অযোগ্য ও অস্পৃশ্য দ্রব্য চতুর্গুণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছি। দুগ্ধে কেবল দুগ্ধের বর্ণ রক্ষিত হয়, তাই উচ্চ মূল্যে ক্রয় করি; সময় সময় বিদেশের আমদানি "গোয়ালিনী মার্কা" গাঢ় দুগ্ধের ব্যবহার করিতে বাধ্য হই। চা'ল দা'লের দুর্ম্মূল্যতা অবর্ণনীয়। বাঙ্গালার এই প্রধান খাদ্যের যে পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই অনুপাতে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে কয়জনের? সুতরাং অর্দ্ধাশন বা অনশন যে অনিবার্য্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। মৎস্য-মাংসের কথা আর না বলিলেও চলে। কুড়ি হইতে চল্লিশ টাকা দরের মৎস্য কিনিয়া কয়জন বাঙ্গালী স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী প্রয়োজনীয় মৎস্য আহার করিতে পারে? এখন বাঙ্গালার বাঙ্গালী জাতি নামে মাত্র মৎস্যাশী, সুতরাং বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য সমূহই একেতো ভেজালে ভরা, তায় আবার ভয়ানক দুর্ম্মূল্য, এ অবস্থায় শরীর রক্ষণোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই বিশেষ আয়াস সাধ্য, এমন কি অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহারা ধনবান্ তাঁহারাও বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন না। কারণ লোকের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন হেতু, অধিকাংশ খাদ্যই ভেজাল ভরা। তাই অনেক সময় মনে হয় বাঙ্গালী কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে?

২। **বিশুদ্ধ পানীয়**।—দুগ্ধ পানীয় হইলেও ইহাকে আমরা খাদ্যের মধ্যে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি; সুতরাং এখন দুগ্ধের কথা রাখিয়া অন্যতম প্রধান পানীয় জলের কথাই বলি। জল ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না, তাই জলের নাম "জীবন"। জানিনা কা'র পাপে বাঙ্গলার এই "জীবন" শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। নদনদী মজিয়া গিয়াছে, পুকুর দীঘি বুজিয়া গিয়াছে, খাল বিল হাজিয়া গিয়াছে; সরস বাঙ্গলা এখন নিরস হইয়া তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে। বিশুদ্ধ জল দূরে যাউক, অনেক স্থলে পঙ্কিল জলও দুষ্প্রাপ্য। কেন এরূপ হইল? কতকটা প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনেও বটে, আর কতকটা আমাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনেও

বটে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জলদানকে মহৎ পুণ্যজনক কার্য্য বিবেচনা করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা শ্রেণীর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিতেন, তদ্দ্বারা গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ হইত। এখন আমরা আর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাকে পুণ্যজনক মনে করিনা, তৃষিত জনগণকে জলদান করা কর্ত্তব্য বলিয়াও বোধ করি না,তাই এখন দেশ হইতে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উঠিয়া গিয়াছে—তাই এখন পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখন শিক্ষালাভ করিতেছি, সভ্য হইয়াছি; তাই আমরা পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অর্থ, বিলাস ব্যসনে ব্যয় করিতেছি, পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত জমিদারীর আয়ে নগরে বসিয়া কত অকার্য্যে কুকার্য্যে অর্থব্যয় করিতেছি; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি লোপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি না। পল্লীগ্রামে জল সংস্থানের উপায় এখন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। এখানেও বাবুদের খেয়ালের বাহাদুরী দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা যায় না। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, নদীর চড়ায় জলের ধারেও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কৃপায় কূপ খনিত হইতেছে; আর যেখানে জল নাই, সেখানকার অধিবাসীগণ বার বার আবেদন করিয়াও বিফল মনোরথ হইতেছে। কিন্তু "ও কথায় কাজ নাই আর।"

যেখানে জল আছে, সেখানেও দেশের জনসাধারণ তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য "জীবন" স্বরূপ জলটুকুকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে না। বিষ্ঠামূত্রযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া, ক্ষারে কাপড় কাচিয়া এবং পশ্বাদির গাত্র ধৌত করাইয়া পানীয় জল নষ্ট করা হইয়া থাকে। তাহারা জানেনা ইহাতে তাহারাই তাহাদের কি সর্ব্বনাশের পথ প্রস্তুত করিতেছে। পল্লীগ্রামের অধিবাসী এই সকল লোকেরা পূর্ব্বে ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল, শাস্ত্রশাসনে শাসিত ছিল; তাহারা জানিত জল নারায়ণ; সুতরাং জল অপবিত্র হয়, এমন কোন কার্য্য তাহাদের দ্বারা হইত না। একেবারে হইত না এরূপ না হইলেও কাজটা খুব বিরল ছিল এবং যাহারা করিত, তাহারা বিজ্ঞদিগের দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইত। এখন ধর্ম্মবিশ্বাস অনেকেরই শিথিল হইয়াছে, কেহই আর শাস্ত্রশাসন মানিয়া চলে না। বিজ্ঞের উপদেশও আর বড় গ্রাহ্য হয় না, কেননা এখন কেহ কাহারও নিকট উপদেশ প্রার্থি নহে, সকলেই উপদেশদাতা। লোকের মতি প্রকৃতি এইরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়াতেই দেশের অনেক পুরাতন প্রথাই "ওলটপালট" হইয়া গিয়াছে। ফলে দেশের জলাশয় সমূহ শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে এবং দেশের লোকেও আর বিশুদ্ধ জল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে।

৩। **নির্ম্মল বায়ু**।—ধূম ধূলিপূর্ণ ঘন বসতি বহুল সহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও এখন সময় সময় বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব অনুভব হইয়া থাকে। ভগবানের স্নেহের দান এবং প্রচুর দান প্রাণীজগতের অত্যাবশ্যকীয় এই বিশুদ্ধ বায়ু পল্লীপ্রদেশে বর্ষাকালে দূষিত হইয়া থাকে এবং বোধ হয় সেইজন্যই পল্লীগ্রামসমূহে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া-বিষ বিস্তারিত হইয়া পড়ে। ঠিক্ যেন বর্ষাধারার সঙ্গেই সে বিষ আকাশ হইতে

নামিয়া আসে। পল্লীপ্রদেশের পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠিত, অধুনা বিলুপ্তপ্রায় শুষ্ক পুষ্করিণী সকল বর্ষার জলে পূর্ণ হইলে এবং গৃহস্থের বাড়ীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবাগুলিতে জল সঞ্চিত হইলে, উহাতে নানাবিধ উদ্ভিদও গোবর প্রভৃতি পচিয়া পল্লীগ্রামের বায়ুর বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া থাকে। অভ্যাসবশতঃ পল্লীবাসী জন সাধারণ সে বিষয় অনুভবও করেনা, বরং জলকষ্টের পর গৃহের অনতিদূরে জলপ্রাপ্ত হইয়া কিছু সুবিধা বোধ করিয়া থাকে। এমন কি অনেক গৃহস্থের মেয়ে ছেলেরা ঐ সকল জলাশয়ের ঘাটে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কার্য্যের জন্য অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া নিশ্বাসের সহিত ঐ পচাগন্ধযুক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া শরীরে পীড়ার বীজ সংগ্রহ করে এবং সমস্ত বর্ষাকালটা রোগভোগ করিয়া হয় মরে, নয় মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের বায়ু দূষিত করিবার আর একটা উপায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং পল্লীবাসী কৃষকগণ অর্থের লোভে ঐ উপায়টাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছে। দেশে পাটের চাষবৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল পাটগাছ জলে পচানর জন্য বর্ষায় সময় দেশময় একটি বিকট দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। সে দুর্গন্ধটা কিরূপ উগ্র ও অশান্তিদায়ক তাহা ঐ সময়ে যাঁহারা রেলপথে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষরূপ অবগত আছেন, তাঁহাদের কাছে আর নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। ক্রমে ঐরূপ অসহ্য গন্ধ সহ্য করিবার অভ্যাস হইলেও, তাহার অপকারিতার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ঠিক ঐ সময়েই আজকাল ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার রোগী রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। যখন পীড়িত ব্যক্তি জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে জল প্রার্থনা করে, তখন তাহারই আত্মীয়স্বজন, তাহার তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠে ঐ পাটপচা জলই প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হয়। হায়! দেশের কি শোচনীয় পরিণাম!

৪। **পরিচ্ছদ**।—দেশের আভ্যন্তরে, পল্লীপ্রদেশে পূর্ব্বে পরিচ্ছদের পারিপাট্য ছিল না। মোটামুটি ধুতি-চাদরেই সম্ভ্রম রক্ষা হইত এবং তাহা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সম্পূর্ণ উপযোগীই ছিল। এখন কিন্তু আর সেদিন নাই। এখন সহর হইতে পরিচ্ছদ পারিপাট্যের বিকট ঘটা পল্লীপ্রদেশেও প্রবেশ করিয়াছে। যাহাদিগকে ১০।১২ বৎসর বয়স হইতেই রৌদ্রবৃষ্টি, শীতাতপ সহ্য করিয়া মাঠে মাঠে কষ্টসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইবে, শিশুবয়স হইতে তাহাদিগের শরীর সেইরূপ ভাবেই গঠিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে তদ্রূপ ব্যবস্থাই ছিল। শিশুদিগকে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শয়ন করাইয়া দেওয়া হইত, শিশুও অকাতরে নিদ্রা যাইত। বর্ষাবাদলের দিনেও শিশুকে স্নান করাইবার নিষেধ ছিল না। ফলে সেই শিশুর শরীর দেশের শীতাতপ সহ্য করিবার উপযোগী হইয়াই গঠিত হইত। এখন কিন্তু ঠিক এরূপভাবে আর শিশুপালন হয় না। এখন সূতিকাঘর হইতেই শিশুর শরীরে নানাবিধ বস্ত্র দেওয়া হয়। রৌদ্রের মুখতো শিশুগণ দেখিতেই পায় না। অনাবশ্যকীয় জামা, জুতা, মোজা টুপিতে শরীর ঢাকিয়া চাষার ছেলে খাসা বাবু বনিয়া উঠে! তারপর সেই সযত্নগঠিত শরীর লইয়া সে যখন মাঠে বাহির হয়, তখন তাহার শরীরের

পরিণাম অবশ্যই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিকই পোষাক পরিচ্ছদের অনাবশ্যক ব্যবহারের ফলেই আমরা আমাদের শরীরটাকে নিতান্তই অকর্ম্মণ্য ও রোগপ্রবণ করিয়া তুলিতেছি।

পরিচ্ছদের কথায় আর একটা বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এখন দেশের ইতর ভদ্র সকলেই বড়লোকের মেয়েদের ব্যবহার্য্য মিহি কাপড়ের অনুকরণে, তাহাদিগের মেয়েদের পরিধানের জন্য বিলাতী মিহি কাপড় ক্রয় করিয়া থাকেন। বোঝেন না যে, তাঁহারা যাঁহাদের অনুকরণ করিয়া বাবু হইতে যাইতেছেন—বড় হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের মেয়েরা বাড়ীর বাহির হ'ন না, তাঁহারা মিহি কাপড় পরিধান করিয়া বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। আর অনুকরণকারীদের মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে আর কোথাও না হউক, স্নানের ঘাটেও যাইয়া থাকেন, তা' সে ঘাট যতদূরই হউক। স্নানান্তে সিক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া যখন মেয়েরা প্রত্যাগমন করিতে থাকেন, তখনকার সে দৃশ্য কি লজ্জাকর। তা' দেখিয়াও চৈতন্য নাই। এমনি বাবুত্বের মোহ!—এমনি সভ্যতার বিকট আকাঙ্ক্ষা! দেশের সকলেই আপন আপন মেয়েছেলেদিগকে মিহি কাপড় পরাইয়া তাহাদিগের লজ্জা-সরমের যে গৌরব ছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দিতেছেন—নিজেরাই নিজেদের মেয়েছেলেদিগকে উলঙ্গ করিয়া জলের ঘাটে বাহির করিতেছেন। ধক এ শিক্ষায়! ধক এ সভ্যতায়! আমাদের দেশে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বেও মোটাকাপড়ের প্রচলন ছিল। তখন চরকা-কাটা মোটা সূতার কাপড়ে লজ্জানিবারণ হইত বলিয়া জলের ঘাটে মেয়েদের এ দুর্দ্দশা দেখিতে হইত না। এখন সভ্যতার খাতিরে, বিলাসিতার মোহে মোটার পরিবর্ত্তে মিহিতে মজিয়া আমাদের এই নৈতিক দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয় এখনই সতর্ক হইয়া মেয়েছেলেদের জন্য লজ্জানিবারণের জন্য উপযুক্ত মোটাকাপড়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

সর্ব্ববিষয়েই আমাদের এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা আমাদের ধাতুর উপযোগী কিনা, তাহা আমরা চিন্তা করিনা বা চিন্তা করিবার অবসরও পাইনা। গ্রামের ধনী লোকদিগের অবকাশ মত কখন কখন নগর হইতে সখের ভ্রমণে পৈতৃক ভিটায় পদার্পণ করেন। তাঁহাদের আগমনে গ্রামে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। দিবাভাগে মাঠে মাঠে বাগানে বাগানে বন্দুকের শব্দ, রাত্রে গ্রামোফোন—হারমোনিয়ামের মধুর সুর, পল্লীবাসী যুবকবৃন্দের উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। নাগরিক বিলাসিতার মোহে অনেকেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই তাঁহাদিগের বেশবিন্যাসের পারিপাট্যে মুগ্ধ হইয়া, চাষার ছেলেও খাসা বাবু সাজিতে ব্যগ্র হয়। এই বাবুয়ানার বিকটত্ব এখন সংক্রামকরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মুটে মজুরের ছেলেরাও পয়সা খরচ করিয়া ছোট বড় করিয়া চুল কাটে, বিড়ি-সিগারেট খায়। নগরের বিলাসবন্যার প্রবল উচ্ছ্বাস পাড়াগাঁকেও ভাসাইতে ছুটিয়াছে। আমাদের বোধ হয় নব সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যই পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্যসম্পদ একেবারেই চূর্ণ করিতে প্রবলবেগে

অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বের অভাবের উপর, পল্লীবাসী আবার নূতন নূতন নানা অভাবের সৃষ্টি করিয়া ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছে। চা, চুরুট, সিগারেট, বিড়িই এখন বাবুদের পরিচায়ক,—তা'র উপর নস্যের নূতন উপসর্গ অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের প্রসার আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। নানাবিধ মৃত জন্তুর চর্ব্বিপক্ক প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রিত ময়দার প্রস্তুত লুচি, কচুরী, সিঙ্গেড়া প্রভৃতি এখন বাবুর জলখাবার! সহরের বর্জ্জিত বাসিপচা নানারূপ নিকৃষ্ট খাদ্যই এখন ফেরিওয়ালার কল্যাণে পল্লীবাসী নব্য সভ্যগণের রসনা তৃপ্তিকর ভোজ্য! ফল, অজীর্ণ অম্ল-অতিসার, তারপর অকালমৃত্যু!

সহরের অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা আছে, যত্ন আছে, আয়োজন আছে; কিন্তু পল্লীগ্রামের অভাব দূর করিবার আশা কোথায়? পল্লীজননীর কৃতীপুত্রগণই নগরের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম করিয়া নাগরিক নামের মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন এবং জননীজন্মভূমিকে জন্মের মত ভুলিয়াছেন! কিন্তু তাঁহারা এত করিয়াও রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন কি? নগরেই রোগের নানামূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি সহকারে বিরাজ করিতেছে,—বাঙ্গালীর ভাবী বংশধর খোকা-খুকীগুলি নগরেই অধিক মরিতেছে। নগরের ন্যায় পল্লীগ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যদি যুগোপযোগী আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে বঙ্গের পল্লীপ্রদেশ আবার তাহার পূর্ব্ব সুখ, পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে পারে। আমাদিগকেও আর বারমাস রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইতে হয় না। এখন প্রশ্ন এই, কি উপায় অবলম্বন করিলে পল্লীগ্রামগুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যপূর্ণ করা যাইতে পারে?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে যে, পল্লীগ্রামগুলির অভাব দূর করিতে পারিলেই পল্লী রক্ষার উপায় হইতে পারে। সে অভাব কি তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এই অভাবসমূহ দূর করিতে হইলে, পল্লীবাসিজনগণকে তাহাদের পৈতৃক ধর্ম্মের বিধি-নিষেধের ভিতর দিয়া যুগোপযোগী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রেই করিতে হইবে। তাহারা শিক্ষিত না হইলে, নিজেদের অভাব নিজেরা না বুঝিলে, উদ্যোগ আয়োজন বৃথা, পরিশ্রম বৃথা এবং অর্থব্যয় ও বৃথা। কিন্তু এই শিক্ষায় নামে বাবুত্বের ও বিলাসিতার প্রসার না বাড়ে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। শিক্ষাটা দেশের ধাতুর উপযোগী না হইলে, সে আবার একটী নূতন উপসর্গ আসিয়া আবির্ভূত হইবে। আচার ব্যবহারে, পোষাক পরিচ্ছদে, খাদ্য পানীয়, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বপ্রকার সংযমী হওয়াই যাহাদিগের শিক্ষার সনাতন পন্থা, তাহাদিগকে শিক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে সুফল ফলিবে না। পুষ্টিকর খাদ্যের নামে, তাহাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের পাকস্থলী যে সকল খাদ্য গ্রহণ করে নাই—তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অখাদ্য কুখাদ্য জ্ঞানে যে সকল খাদ্য বর্জ্জন করিয়াও পূর্ণ স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল যেন প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজে একটা নূতন উপসর্গ আনয়ন করা না হয়। এ শিক্ষার স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় না দিয়া, শাস্ত্র শাসনের অধীন থাকিয়া খাদ্য

পানীয় প্রভৃতি গ্রহণ বর্জ্জনের ব্যবস্থা এবং সেগুলিকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিবার উপায়-শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

পল্লীপ্রদেশে স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রচারের জন্য বক্তা নিযুক্ত করিতে পারিলে, সুফল পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি এবং নিম্ন শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার যে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এক বর্ণযোজনা ভিন্ন আর কিছু যে শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা একপ্রকার নিশ্চিত কথা। এই বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ভাষা, অঙ্ক ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটু ভালরকম শিখাইতে পারিলে সুফলের আশা করা যাইতে পারে।

যাহা হউক উপসংহারে বক্তব্য এই যে, দেশের বিষয় যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, পল্লীগ্রামগুলি কিসে রক্ষা পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তাকেই প্রাধান স্থান প্রদান করা। মুমূর্ষু পল্লীজননী এখন তাঁহাদেরই মুখ চাহিয়া আছেন—যাঁহারা দেশের ও দশের প্রতিনিধি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তি বঙ্গের পল্লী রক্ষায় মনোযোগী হউন, তবে তাঁহাদের কার্য্যের সফলতা—তবে তাঁহাদের কার্য্যের সার্থকতা। কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, পল্লী রক্ষা না হইলে দেশ রক্ষা হইবে না।

শিশু-পালন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু—বি-এ, সরস্বতী]

শিশুর চরিত্র গঠন।

শিশুকে মানুষ করিতে হইলে শুধু তাহার শারীরিক উন্নতির প্রতি মনোযোগ রাখিলে চলিবে না, তাহার চরিত্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার চরিত্র গঠনের দিকে প্রত্যেক মাতার মন দিতে হইবে। এক সময়ে একটি ইংরাজ রমণী তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু বালককে এক পাদ্রীর নিকট লইয়া গিয়া বলেন যে, এই শিশুকে কত বৎসর হইতে নীতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন। পাদ্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "কি, এখনও আপনি ইহার চরিত্র গঠনের দিকে মন দেন নাই? শীঘ্র আরম্ভ করুন, বড় দেরী হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্মের দশ মাস পূর্ব্ব হইতেই যে ইহার নীতি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে।" রমণী অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। শিশু-

মাতার জঠরে থাকিতে থাকিতেই তাহার মানসিক শিক্ষার আরম্ভ হয়। মাতা সর্ব্বদা যেমন চিন্তা করিবেন, যেমন মনের ভাব হইবে শিশুর সেইরূপ হইবে। মাতা ধর্ম্ম-পরায়ণা, সৎকর্ম্মে অনুরাগিণী, তেজস্বিনী, স্বদেশ প্রেমিকা ও সুশিক্ষিতা হইলে সন্তানের প্রাণেও সেই মহৎ ভাবসমূহ মুদ্রিত হইবেই। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই সৎ ও মহৎ ভাবসমূহ অনুশীলন দ্বারা তাহার চরিত্রে ফুটাইয়া তোলা প্রত্যেক মাতার কর্ত্তব্য। মাতা সর্ব্ববিষয়ে গুণবতী হইলে সন্তানের প্রাণে সদগুণের অঙ্কুর থাকিবেই। তাহা অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতে প্রত্যেক মাতা বিধাতার নিকট দায়ী। নতুবা তিনি মাতা হইবার অযোগ্য।

সন্তানকে সাধু দেখিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্ব প্রথমে মাতা তাহাকে বাধ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিবেন। সন্তান বাধ্য ও সত্যবাদী হইলে অন্য সব গুণ শিক্ষা দিতে কোনই কষ্ট হইবে না। দোলায় থাকিতেই শিশুকে বাধ্যতা শিক্ষা দিবে। বড় হইলে বাধ্য ও সত্যবাদী হইবে, ছেলেবেলায় যেমন দোষ থাকে থাক্, এরূপ মনে করা মারাত্মক ধারণা! কথায় বলে, "কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাক্‌লে করে টাঁস টাঁস।" শৈশবে সমস্ত সদ্‌গুণের ভাব অন্তরে বদ্ধমূল না করিয়া দিলে, বড় হইলে আর তাহা মুদ্রিত হইবে না। সুতরাং সন্তানকে বাধ্যতা শিক্ষা দিতে হইলে শৈশবেই তাহা করিবে। যে শিশু পিতামাতার ইচ্ছানুসারে না চলিয়া আপনার ইচ্ছানুসারেই চলে অথবা চলিতে দেওয়া হয়, সে ভবিষ্যতে কখনই আপনাকে শাসনে রাখিতে পারিবে না। অনেক পিতামাতা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তান যে আবদার করে তাহা যতই অসঙ্গত হউক না কেন, পূর্ণ করেন। ইহাতে তাঁহারা সন্তানের কি ঘোর অনিষ্টসাধন করেন তাহা ভবিষ্যতে তাহার ফল ভোগ করিলে তবে বুঝিতে পারেন। পিতামাতার ন্যায় সন্তানের হিতৈষী আর কেহ নাই। কিন্তু এতদ্বারা তাঁহারা সন্তানের শত্রুর ন্যায় কার্য্য করেন। ভালবাসা দ্বারা সন্তানকে বাধ্য করিবে,—ভয় দেখাইয়া নয়। কারণ একবার ভয় ভাঙ্গিয়া গেলে আর সন্তান বাধ্য থাকিবে না। সন্তানের অসঙ্গত আবদারে কখনও কর্ণপাত করিবে না, কিন্তু তাহাকে কখনও কোন অসঙ্গত আদেশও পালন করিতে বলিবে না। একবার একটা আদেশ দিলে দেখিবে যেন সে আদেশ পালিত হয়। মাতা একটা আদেশ দিলেন অথচ তাহা শিশু পালন করিল কিনা তাহা দেখিলেন না—ইহাতে অত্যন্ত কুশিক্ষা হয়। শিশুর মনে মাতার আদেশের প্রতি কোন শ্রদ্ধাই থাকে না, সে জানিতে শেখে যে "মা অমন কত কথাই বলেন কিন্তু তা' শুনি বা না শুনি তা'তে বড় আসে যায় না। শিশু মাতার ইচ্ছা মানিয়া চলিবে বলিয়া এমন যেন না হয় যে তাহার সঙ্গত প্রার্থনাও পূর্ণ হইবে না। শিশুর সঙ্গত ও ন্যায্য প্রার্থনা সর্ব্বদা পূর্ণ করিবে। তাহার সমস্ত ইচ্ছাই দমন করিতে গেলে তাহার স্বভাব ভীরু হইয়া যাইবে, মনের স্বাধীনতার ভাব লোপ পাইবে, আপনার প্রতি বিশ্বাস হারাইবে। এরূপ হইলে তাহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না, মনের স্ফূর্ত্তি থাকিবে না,

নিজে কিছু করিবার শক্তি হারাইবে। শিশুকে ইহাই জানিতে দিবে যে, তাহার সঙ্গত ও ন্যায্য প্রার্থনা সর্ব্বদাই পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহার অসঙ্গত ও অন্যায় আবদার কখনই পূর্ণ হইবে না। সে জানুক যে সে যদি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যায় তথাপি তাহার অসঙ্গত আবদার পিতামাতা শুনিবেন না। তাহা হইলে একদিকে বাধ্যতা অপরদিকে স্বাধীনতা শিক্ষা হইবে। শিশু দোলায় থাকিতেই এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবে। শিশু আজ ঘুমাইবার সময় নিজের শয্যায় শুইবে না বলিয়া কাঁদিতে থাকিলে তুমি যদি তাহাকে কোলে লও, কল্য ও শিশু ঐ সময় কাঁদিবে এবং আশা করিবে তুমি তাহাকে কোলে লইবে। এইরূপে বড় হইলেও সে যখন যে জিনিস চাহিবে তাহা দিতে না পারিলে কাঁদিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিবে এবং যখন আর কাঁদিবার বয়স থাকিবে না তখন নিজের ইচ্ছামত সব না হইলে সর্ব্বদাই বিরক্ত হইয়া থাকিবে, অন্যের সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে কিংবা বকাবকি করিয়া সংসারে অশান্তি আনিবে। সুতরাং বাধ্যতা যেন শিশু গৃহের প্রথম নিয়ম হয়। শৈশবকাল হইতে যে শিশু পিতামাতার বাধ্য হইয়া বাড়িয়া উঠে, ভবিষ্যতে সে তাঁহাদের গৌরবস্বরূপ হইবেই। মনে রাখিও, যে শিশু গুরুজনের আদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে পালন করিতে শিক্ষা করিবে, বড় হইলে সেই মানুষই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে অপরকে আদেশ দিতে পারিবে। একটি বাধ্য শিশুর জননায়ক হইবার যেমন সম্ভাবনা তেমন যে শিশু সর্ব্বদা আদেশ পালনে অস্বীকার করে তাহার তাহা নাই।

শিশুকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিতে, সত্য আচরণ করিতে শিক্ষা দিবে। শুধু মুখে বলিলে হইবে না মাতাকে বাক্যে, আচরণে, ব্যবহারে ভাবে সত্য হইতে হইবে। শত শত বাক্য ও উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক শিক্ষাপ্রদ। মাতা সন্তানকে যেরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করিবেন অগ্রে নিজে সেইরূপ হইয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, শিশুর নিকট তাহার মাতাই তাহার আদর্শ। শিশু মাতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকরণ করে। মাতা নিজে সত্য কথা বলিবেন, বাড়ীর সমুদয় পরিজনবর্গ দাসদাসী প্রত্যেককেই অন্ততঃ শিশুর সম্মুখে সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিবেন। মাতা শিশুর প্রাণে মিথ্যার প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মাইয়া দিবেন। যে কেহ মিথ্যা বলিবে শিশু তাহাকে ঘৃণা করিবে, সুতরাং শিশুর ঘৃণা পাইবার ভয়ে তাহার নিকট মিথ্যা বলিবে না। ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ীর একটি শিশুকে তাহার ক্রন্দন থামাইবার জন্য গভীর রাত্রিতে দাসী এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছিল যে, "চুপ কর, রসগোল্লা দিব।" শিশু তাহা শুনিয়া চুপ করিল। লাহিড়ী মহাশয় দাসীর কথা শুনিয়া তখনি উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলেছ যে, একে রসগোল্লা দেবে, তখন এখনি যাও, রসগোল্লা এনে দাও।" এই বলিয়া দাসীকে সেই রাত্রিতে দোকানে পাঠাইয়া রসগোল্লা আনিয়া শিশুর হাতে দিয়া তবে ক্ষান্ত হইলেন। এই একটি কার্য্য দ্বারা তিনি দাসীকে যেমন শিক্ষা দিলেন শিশুর নিকট সত্যরক্ষাও তেমনি করিলেন। এই মহাত্মার এই সত্যপরায়ণতার এই

একটি দৃষ্টান্ত সমগ্র মাতৃ সমাজের সম্মুখে শিশুপালনের একটি আদর্শ হইয়া রহিয়াছে শুধু নিজে ভাল হইলে হইবে না, বাটীর সকল পরিজনের, পাড়াপ্রতিবাসী সকলেরই সৎ-স্বভাবের হওয়া আবশ্যক নতুবা সন্তানকে সাধু করিয়া গড়িয়া তোলা দুরূহ ব্যাপার। পিতা মাতা নিজে সত্যবাদী হইবেন, সত্যরক্ষা করিবেন, সত্য আচরণ করিবেন এবং যে সংসর্গে শিশুকে রাখিবেন তাহাও, সৎ হইবে তবে সন্তানের জন্য কোন ভয় নাই। অনেক সময় শিশু কৌতূহল বশতঃ এমন অনেক বিষয়ের কারণ জানিতে চায় যাহার প্রকৃত কারণ মাতা জানেন না। এরূপ স্থলে প্রায়ই মাতা একটা কল্পিত কারণ তৈয়ার করিয়া শিশুর কৌতূহল নিবারণ করেন কিংবা ধমক দিয়া শিশুকে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। প্রথম কার্য্য শিশুর নিকট মিথ্যা বলা এবং দ্বিতীয় কার্য্য দ্বারা শিশুর স্বাভাবিক জানিবার আকাঙ্ক্ষা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং মাতা শিশুর জিজ্ঞাস্য বিষয়টির কারণ জানিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন এবং প্রকৃত কারণটি তাহাকে বলিবেন। শিশু জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন যে "আমি এখন জানিনা, পরে জানিয়া তোমাকে বলিব"।

শিশুর প্রতি শ্রদ্ধা রাখা পিতামাতার কর্ত্তব্য। শিশুর সদাকঙ্ক্ষা, সাধুভাব উৎসাহ দিয়া আরো ফুটাইয়া তুলিবে। শিশু ধর্ম্মের কোন কথা বলিলে বা জানিতে চাহিলে তাহা জেঠামি বলিয়া উপহার করিবে না। ধর্ম্ম-ভাবের বীজ শৈশব হইতেই বপন করিবে তবে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া বসিবে যে কখনো তাহা নষ্ট হইবে না। আমেরিকার বিখ্যাত রাজনৈতিক জন ব্যাণ্ডলফ্ বলিয়াছেন, "শৈশবে আমার মা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আমার ছোট হাত দুটি জোড় করিয়া তাঁহার হাতের মধ্যে লইয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন তাহারই স্মৃতি, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শত প্রলোভন, সংগ্রাম, বিপদ, কষ্টের মধ্যেও আমাকে স্থির রাখিয়াছে; নতুবা আমি নাস্তিক হইয়া যাইতাম।" জগতের কত শত বিখ্যাত লোকের মহৎ জীবনী তাঁহাদের মাতার এই ধর্ম্ম শিক্ষার প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। শৈশবে মানুষের মন সাদা থাকে, তখন যে ভাবের রেখা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইবে তাহাই দৃঢ় হইয়া বসিবে, তাহা কখনো মুছিয়া যাইবার নহে। শিশুর কোমল প্রাণে সর্ব্বদা এই ভাব দৃঢ় করিয়া দিবে যে, আঁধারে আলোকে—সজনে নির্জ্জনে—যখন যেখানে থাকিবে, যাহা করিবে মানুষ না দেখিলেও ভগবান তাহা তোমার সঙ্গে থাকিয়া দেখিতে-ছেন। ইহার দৃষ্টান্ত শিশুর শক্তির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখিবে। বালকবালিকার কবিতা লিখিবার, বক্তৃতা দিবার, অঙ্কন করিবার শক্তি দেখিলে তাহা উৎসাহ দিয়া বাড়াইয়া তুলিবে; কখনো অবহেলা করিবে না। ৬।৭ বৎসরের হইলে বালকবালিকাকে কোন দায়ীত্বপূর্ণ কাজ দিয়া তাহার কার্য্য-ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ জন্মাইয়া দিবে। যেমন একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বালকবালিকাকে একটি বাক্স তাহাদের মনোমত দ্রব্যাদিতে পূর্ণ করিয়া তাহার চাবি তাহাদের হস্তে দিয়া মাতা বলিবেন, এই বাক্স সাজাইয়া গুছাইয়া

রাখা জিনিস পত্র সাবধানে রাখা তোমাদের হাতে। আমি মাঝে মাঝে দেখিব—তোমরা কে কেমন সুন্দর করিয়া তোমাদের এই কাজ কর"। মাতার এই বাক্যে তাহারা আনন্দের সহিত এটু কাজ করিবে। ইহাতে তাহাদের দায়ীত্ববোধ, জিনিস পত্রের যত্ন লওয়া ও একটা কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মিবে এবং এই জ্ঞানগুলি আনন্দ ও খেলাধুলার মধ্য দিয়াই হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন দিন কিছু পয়সা হাতে দিয়া তাহাদের বলিতে পার যে দেখি তোমরা এই পয়সা কটি কেমন করিয়া খরচ কর এবং যে খরচ করিবে তাহার একটা হিসাব রাখিবে, যদি সদ্ব্যহার কর তবে এই পুরস্কার পাইবে। তারপর নির্দ্দিষ্টদিনে তাহাদের হিসাব দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে কে কি ভাবে খরচ করিয়াছে, কে কোন কাজে খরচ করিয়া পয়সার সদ্ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি কেহ বৃথা কাজে পয়সা নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহার কাজটি বৃথা কেন, এরূপ কাজে পয়সা ব্যয় করা উচিত হয় নাই ইত্যাদি বলিয়া উপদেশ দিবে। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁহার পিতা যাহা করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। শিশুর প্রাণে সর্ব্বদা এই ভাব জাগ্রত করিয়া রাখিবে যে তাহার ভিতর অনেক শক্তি আছে, চেষ্টা করিলে সে জগতের মহৎ লোকদিগের মধ্যে আসন পাইতে পারিবে। আমেরিকার প্রত্যেক শিশু মনে করে যে কালে সে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পদ লাভ করিবে। এইরূপে শিশুর প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দিবে। সর্ব্বদা জগতের সাধু-সাধ্বী, জ্ঞানী-গুনি, স্বদেশ প্রেমিক মহাপুরুষদের আত্ম-ত্যাগের, বীরত্বের, পাণ্ডিত্যের, অধ্যবসায়ের, পরিশ্রমশীলতার, দয়ার গল্প বলিবে এবং তাঁহাদের জীবনী পড়িতে দিবে। শৈশব হইতে তাহাদিগকে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। তাহা হইলে তাহাদের মহৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আত্মার সুপ্ত শক্তি ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী জাতি আবারা মানুষ হইয়া জগতের মাঝখানে দাঁড়াইবে। বাংলার প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক বালক বালিকা বাংলার জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদকে প্রাণপণ যত্নে রক্ষা করা, শ্রীবৃদ্ধি সাধন করার ভার বাংলার প্রত্যেক নবীনা মাতার হস্তে ন্যস্ত। তিনি ইচ্ছা করিলে বঙ্গ জননীর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন অথবা মলিন করিতেও পারেন।

(ক্রমশঃ)

কুলের কথা।

[কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ন]

"কুল" সকলেই খাইয়া থাকেন, কিন্তু 'কুলে'র যে সকল রোগনাশিনী শক্তি আছে তাহা সাধারণ পাঠক অবগত নহেন, এজন্য আমরা অদ্য 'কুলে'র কথা বলিব। কুলের সংস্কৃত নাম—বদর, কুল ও বরই। হিন্দী নাম—বের।

হিক্কা রোগে কুলের বীজ।—কুলবীজ ভাজিয়া তন্মধ্যস্থ যে শাঁস পাওয়া যায়, ঐ শাঁস স্তন দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে হিক্কা রোগের উপশম হইয়া থাকে। যাবৎ হিক্কা থাকিবে তাবৎ কাল মধ্যে মধ্যে সেবন করাইবে।

কাস রোগে—কুল বীজের শাঁস দধির মাতের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে কাস রোগ উপশমিত হয়।

স্বরভেদ ও কাসে—কচি কুলের পাতা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ গব্যঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ ও কাস প্রশমিত হয়।

অতিসারে—কুল গাছের মূলের ছাল চূর্ণ দুই আনা একটু মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি হয়।

প্লীহোদরে কুলের পাতা।—প্লীহা অতি বৃদ্ধিবশতঃ উদরী রোগে পরিণত হয়, ইহাতে জলোদরী রোগীর ন্যায় পেটের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুলের পাতা তিল তৈলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া প্লীহার স্থানে মর্দ্দন করিবে, তৎপর হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে প্লীহার স্থান টিপিতে থাকিবে, এইরূপ প্রত্যহ করিবে। রোগী কেবল দুগ্ধ সেবন করিবে। অন্নাদি ভোজন নিষেধ। এই নিয়মাধীনে থাকিলে প্লীহা ক্রমশঃ ছোট হইয়া উদর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইবে।

রক্তাতিসারে—চারি আনা পরিমিত কুল গাছের মূলের ছাল ছাগী দুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু সহ সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

প্রদরে—বীজ রহিত কুল চূর্ণ চারি আনা, ইক্ষুগুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর উপশমিত হইয়া থাকে।

স্থূলকায়ে কুলের পাতা—অতি স্থূল ব্যক্তি প্রত্যহ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ কুলের পত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া সেবন করিলে দেহ কৃশ হইবে।

আমাশয়ে কুলের পাতা—চারি আনা পরিমাণ কুলের পাতা দধির সহিত পেষণ করিয়া, পুনরায় দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে রক্ত আমাশয় ও সাদা আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

ফোড়া পাকায়—কুলের পত্র যজ্ঞ ডুমুরের পত্রের দ্বারা পুলটীশ দিলে অপক্ক ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

বসন্ত রোগে কুল—বীজহীন কুলচূর্ণ

ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে বাত-পিত্ত-কফজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

মন্দাগ্নিতে কুলের বীজ—যাহাদিগের ক্ষুধা মান্দ্য হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কুলের বীজের শাঁস জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

রক্তপিত্তে কুলের পত্র—মুখ দ্বারা রক্ত নির্গত হইলে কচি কুলের পত্র চারি আনা, মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্ত বমন নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

পল্লী-প্রসঙ্গ।

—::—

মসূরিকা বা বসন্ত বোধ হয় বাঙ্গালায় চির-ব্যাপী হইল। কলিকাতায় ইহার প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু মফঃস্বলের স্থানে স্থানে এখনও ইহার আক্রমণের কথা শুনা যাইতেছে। মেদিনীপুর-কাঁথির সহযোগী "নীহার" জানাইতেছেন,—

হাম ও বসন্ত এখনও স্থানে স্থানে লাগিয়া রহিয়াছে। জ্বরেও লোক আক্রান্ত হইতেছে।

সহযোগী "মেদিনীপুর হিতৈষী" ও ইহার সমর্থন করিয়া বলিতেছেন,—

মেদিনীপুর জেলার সর্ব্বত্রই এখনও ভীষণ জ্বর, বসন্ত, কলেরা ও আমাশয়াদির প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। এই দারুণ গ্রীষ্মে নিউমোনিয়াতেও বহুলোক মরিতেছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার সংবাদও অনেক স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। খুলনার সহযোগী "খুলনাবাসী"তে প্রকাশ,—

ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব।—ডুমুরিয়া থানা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রভাব বিশেষভাবে বাড়িয়াছে। ডুমুরিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু যতীন্দ্রনারায়ণ গুহ রায় গত সপ্তাহে ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বাসার আরও কয়েকজন ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ তো বাঙ্গালীর পক্ষে চির-সহনশীল। বাঙ্গালায় ইহার আক্রমণ বার মাসই অল্প বিস্তর আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার অন্তে ইহার বিশেষভাবে প্রকোপ হইয়া থাকে। এবার বাঙ্গালায় বর্ষার পূর্ব্বেই ইহার আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। "ঢাকা-প্রকাশ" সংবাদ দিতেছেন,—

এবারকার জ্বরের প্রবল আক্রমণে চাঁদপ্রতাপের অধিকাংশ অধিবাসী দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই জ্বর-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কোন কোন বাড়ীর প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী; যাহার উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহাকেই অন্য রোগীদের পথ্যাদি কোনমতে দিতে হইতেছে। ঐ সকল বাড়ী দেখিলে ক্ষুদ্র হাসপাতাল বলিয়া মনে হয়। দরিদ্র গৃহস্থদের অনেকে অর্থের অভাবে ঔষধ ও পথ্যের যোগাড় করিতে পারিতেছে না। এই জ্বরের লক্ষণও অতি অদ্ভুত; অধিকাংশ জ্বরের পূর্ব্বভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম দিন সামান্য জ্বর হয়, এবং অল্পকাল মধ্যেই কমিয়া যায়; তৎপর দিবস শরীর ভালই বোধ হইয়া থাকে।

কিন্তু তার পর দিনই রোগী জ্বরের প্রবল আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়ে। এই জ্বরে পিত্ত খুব বৃদ্ধি পায়, এবং তদ্দরুণ শরীরে বিশেষতঃ মাথায় অতিমাত্রায় প্রবাহ হইয়া থাকে। চিকিৎসাদির ত্রুটিতে অনেকেরই জ্বরের গতি মন্দর দিকে যাইতেছে। দুঃখের বিষয়, এ অঞ্চলে অনেক কাল হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব।

বাঙ্গালাদেশ যেরূপ রোগ-প্রবণ, বাঙ্গালাদেশে সে পরিমাণ চিকিৎসকের কিন্তু একান্তই অভাব। সরকারি হিসাবেই, প্রকাশ, ভারতবর্ষের লোক সংখ্যার তুলনায় এখনও চল্লিশ হাজার চিকিৎসকের প্রয়োজন। আধিব্যাধির লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশকে রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালী ছাত্র যাহাতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ময়মনসিংহের "চারুমিহির" বলিতেছেন,—

এই নগরে একটী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব কর্য্যে পরিণত করার জন্য গত পূর্ব্ব শুক্রবার দিবস স্থানীয় টাউনহলে জনসাধারণের যে সভা হইয়াছিল সেই সভায় ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান বাবু শশধর ঘোষ সেটেলমেণ্টের উদ্বৃত্ত টাকা এই জেলার মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনোদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার কথা উত্থাপন করেন এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন বিষয়ে এই স্থানে যে কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে ঐ সমিতির প্রতি শশধর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণ হইতে গৃহীত এই টাকা দ্বারা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে সহায়তা করিবেন।

কলিকাতার মেডিকেল কলেজে আসাম হইতে প্রতিবৎসর মাত্র ৬জন করিয়া ছাত্র গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। শিলচরের "সুরমা" এই উপলক্ষে বলিতেছেন,—

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রতিবৎসর আসাম হইতে ৬ জন ছাত্র লওয়া হয়। এই ছয় জনের তিন জন ব্রহ্মপুত্র ভেলির এবং বাকী তিন জন আসাম ভেলির। আসামের লোকসংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হয়—আসাম বিশেষতঃ শ্রীহট্ট কাছাড় হইতে আরো অধিক সংখ্যক ছাত্র লইবার ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

জল কষ্টই যে বাঙ্গালার রোগপ্রবণতার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বাঙ্গালার ম্যালেরিয়া বাঙ্গালীর জল কষ্টেরই ফলসম্ভূত। বাঙ্গালার কলেরা বাঙ্গালীর জলকষ্টের সর্ব্ববাদী সম্মত ভীষণ ফল। কিন্তু এ জলকষ্ট দূর করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা কি করিতেছি? জেলাবোর্ড এবং লোকালবোর্ড প্রভৃতি হইতে প্রতিবৎসর এই জলকষ্ট নিবারণ কল্পে কিছু কিছু অর্থব্যয় করা হয় বটে কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। নদীয়া জেলার দৌলতপুর অঞ্চলের জলকষ্টের পরিচয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরের "বঙ্গরত্ন" বলিতেছেন,—

নদীয়া জেলায় থানা দৌলতপুরের অন্তর্গত পাকুড়িয়া ও মহিষকুণ্ডী গ্রামের নিকটবর্ত্তী ৩।৪ মাইল মধ্যে কোন নদী বা পানীয় জলের উপযুক্ত ইন্দারা বা পুষ্করিণী না থাকায় পল্লীবাসীর ভীষণ জলকষ্ট হইয়াছে। একেই অন্নাভাব, তাহার উপর জলকষ্ট। গরীব কৃষকগণ গ্রীষ্মকালে উপায় বিহীন হইয়া বাধ্য হইয়া অপরিষ্কার জল পান করিয়া নানাবিধ সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। আশা করি নদীয়া জেলাবোর্ডের ও কুষ্টিয়া লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও মেম্বার মহোদয়গণ তদন্ত করিয়া গরীব পল্লীবাসীদের জলকষ্ট নিবারণ করতঃ তাহাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

এই জলকষ্ট উপলক্ষ করিয়া যশোহরের মুখপত্র "যশোহর" কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন,—

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসের মূল্য হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। মাগুরার চাউলের মণ ১২৲ টাকা। কাপড় কাগজের কথা ত না বলিলেও চলে। তদুপরি ভীষণ জলকষ্ট। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমের সুজলা বঙ্গভূমি যেন পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। মাঘ মাসের প্রথম হইতেই বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে পিপাসিতের আর্ত্তনাদ শ্রুত হয়, যশোহর আবার সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। পিতৃ-পিতামহের প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণী ও দীঘিগুলির কতকগুলি শুকাইয়া গিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শৈবালদামে আচ্ছন্ন হইয়াছে। বয়সের মধ্যে ছয়মাই গ্রামবাসীগণকে কর্দ্দমাক্ত জল পান করিয়া কোনমতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়, ফলে পৌষ মাঘ মাসের প্রারম্ভেই গ্রামে গ্রামে আমাশয়ের তাণ্ডবনৃত্য, আর সহস্র সহস্র লোকের মৃত্যু! এই জলকষ্টের বিষময় ফল জননী ভগিনীগণকেই বেশী ভোগ করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি, অনেক গ্রামের কুললক্ষ্মীদিগকে পিতামাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয় স্বজনের পিপাসার একবিন্দু বারি প্রদানের জন্য এক মাইল দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া কাদাজল সংগ্রহ করিতে হয়।—অচিরে এই জলকষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে কি?

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে খুলনার উড্‌বর্ণ হাসপাতালটি নাকি অর্থাভাবে অচল হইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। খুলনার সহযোগী "খুলনাবাসী"ই এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন,—

স্থানীয় উডবর্ণ হাসপাতালটী অর্থাভাবে অচল হইবার মত হইয়াছে। রীতিমত চাঁদা আদায় হয় না, অথচ দৈনন্দিন ব্যয় বাড়িতেছে, কাজেই অনাটনও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আমরা শুনিলাম, স্থানীয় মিসনরী মিঃ মিলনে সাহেবের পত্নী হাসপাতালের চাঁদা আদায় করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিসেস্ মিলনে কৃতকার্য্য হইলে খুলনাবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্রী হইবেন।

খুলনার গণ্যমান্য অধিবাসীদিগেরও এজন্য চেষ্টাশীল হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা খুলনার স্বদেশ-সেবকদিগকে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান।

মূত্র শৌচ।

[ডাঃ শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।]

(১৩২৬ পৌষ সংখ্যার ১৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

রক্তের যে সকল বিষাক্ত অংশ মূত্র রূপে দেহ হইতে নির্গত হয় তাহার তীব্র বিষ ক্রিয়া এতই অধিক যে, দশ দিনকাল কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে মূত্র পরিত্যক্ত হইলে তৎ স্থানের স্বভাব জাত তৃণ গুল্মাদির জনন শক্তি বা বীজ নষ্ট হইয়া যায় এবং পূর্ব্বজাত দুর্ব্বা প্রভৃতি তৃণ গুলি যে সদ্য সদ্যই দগ্ধ হয় তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? সুতরাং মূত্র পদার্থ যে

তীব্র বিষাক্ত তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সেই বিষাক্ত পদার্থ দেহের কোন অংশে অথবা বস্ত্রাদিতে লাগিলে সেই সকল স্থানও যে বিষাক্ত হয় তাহা অতি সহজেই বোধ গম্য হইবার কথা। উক্ত বিষাক্ত পদার্থ যাহাতে দেহের কোনো অংশে বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইয়া ভাবী কোন অনিষ্ট উৎপাদন করিতে না পারে সেই নিমিত্তই মূত্র শৌচের ব্যবস্থা। "শরীর-মাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনম্।" এই সার বচনটিতে স্পষ্টই উচ্চকণ্ঠে বলা হইয়াছে যে শরীর রক্ষা বা স্বাস্থ্যরক্ষাই ধর্ম্ম রক্ষা। একালে স্বাস্থ্য-রক্ষাই ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ক বহু পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়াও যে শিক্ষকগণকে মূত্র শৌচে-পরাঙ্মুখ দেখা যায়, সেই দুঃখেই নানা কথার উল্লেখ করিতে হয়। ফলতঃ যাহা অস্বাস্থ্যকর তাহাকেই অপবিত্র এবং অধর্ম্ম জনক বা অশৌচকারক ইত্যাদি শব্দে প্রাচ্য-শাস্ত্রে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা সদাচার, ধর্ম্ম বা পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ব্যঙ্গ পূর্ব্বক কুটিল কটাক্ষপাত করেন ওদিকে স্বাস্থ্য অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে ছুটা-ছুটি করেন, তাঁহাদের বুঝিবার জন্যই এতগুলি কথার অবতারণা করিতে হইল। নতুবা শাস্ত্র-বাক্য অবশ্য পালনীয় বলিয়া ব্যবস্থা গুলি লিখিলেই যথেষ্ট হইতে পারিত। এক্ষণে নিম্নে আমরা যথা শাস্ত্র মূত্রশৌচের ব্যবস্থাদিতে কাল ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ভাবেই ব্যাখ্যা করিলাম। এজন্য সদাচার পরায়ণ শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিতগণ আমাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মূত্র ত্যাগান্তে স্ত্রীপুরুষ সকলেরই মূত্রদ্বারে একবার মৃত্তিকা লেপন করতঃ জলদ্বারা ধৌত করিয়া ফেলিবে, অনন্তর হস্তদ্বয়ও মৃত্তিকা-দ্বারা লেপন করিয়া পরিষ্কার ভাবে ধুইয়া ফেলিবে, তৎসঙ্গে পাদ দ্বয় ধৌত করিয়া পবিত্র হইলাম জ্ঞানে ভগবানকে স্মরণ পূর্ব্বক শুদ্ধ হইবে। মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক জল দ্বারা ধৌত করিলে কোনরূপ রোগবীজ দেহ বা বস্ত্রাদিতে সংলগ্ন হইবার ভয় এককালে বিনষ্ট হয় বলিয়াই ঐরূপ ব্যবস্থা। দিবসের শৌচ বিধি যাহা ব্যবস্থা আছে রাত্রে তদপেক্ষা অর্দ্ধেক করিলেই চলে। আবার আজকাল রেল বা ষ্টীমারাদিতে উহার মৃত্তিকা প্রয়োগ চলে না বলিয়া যে সকল অপবিত্রতার কারণ উপস্থিত হয়; তাহার সংশোধন কল্পে যথাস্থানে উপনীত হইবার পর বস্ত্রাদি পরিত্যাগ এবং মৃত্তিকা শৌচ ও যথাসাধ্য প্রক্ষালন বা স্নানাদি দ্বারা শৌচ হইয়া পবিত্র চিত্তে বিষ্ণুস্মরণ করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। কোন অনিবার্য্য কারণে বা পথ পর্য্য-টন প্রভৃতি কালে জল দুষ্প্রাপ্য হইলেও কদাচ মূত্রাদির বেগ ধারণ না করিয়া বিনা শৌচেই পরিত্যাগ করিবে কিন্তু পরবর্ত্তী কালেই যথা স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্তরূপ শৌচ ব্যবস্থা করিতে হইবে। রোগীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রাত্রিকালের শৌচের অর্দ্ধেক ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। নিতান্ত অক্ষম রোগীর পক্ষে সুশ্রূষা-কারীগণ কর্ত্তৃক যথাসম্ভব শৌচের ব্যবস্থা কর্ত্তব্য। কারণ শৌচ কার্য্যে রোগ আরোগ্য পক্ষেও সাহায্য হয়। শৌচাচার বিহীন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হয় বলিয়া সকল কার্য্যই নিষ্ফল হয়। এই নিমিত্ত স্বাস্থ্যকারীগণ যত্নের সহিত শৌচাচার প্রতিপালন করিবেন।

বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে শৌচ দুইপ্রকার।

মৃত্তিকা এবং জলদ্বারা বাহ্য শৌচ আর মনোভাব শুদ্ধি দ্বারা অন্তর শৌচ সম্পন্ন হয়। পর্ব্বতপ্রমাণ মৃত্তিকা বা বহু পরিমাণ গঙ্গাজল দ্বারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বারম্বার স্নাত হইলেও মনোভাবদুষ্টব্যক্তি শুদ্ধ হয় না। এজন্য মনোভাব শুদ্ধির অত্যন্ত আবশ্যক। বাহ্য শৌচাদির দ্বারা নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়াছি জ্ঞানকরতঃ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ স্মরণ করিলেই মনোভাব শুদ্ধি হইয়া থাকে। এজন্য শৌচাদির পরে আচমনপূর্ব্বক শুদ্ধ হইলাম জ্ঞানে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। যেস্থানে শৌচকৃত হইবে পরিমিত জলদ্বারা সে স্থানকে শোধন করিবে। নতুবা শৌচকৃত অপবিত্র স্থানে রোগবীজ জন্মিয়া ভাবী অমঙ্গলের কারণ হয়। এজন্য যে ব্যক্তি ঐস্থান শোধন না করে তাহার শৌচ সিদ্ধি হয় না।

শৌচানন্তর গোময় বা মৃত্তিকাদ্বারা শৌচ জন্য পাত্র মার্জ্জন করিয়া পূর্ব্ববৎ আচমনপূর্ব্বক সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিকে যথাসম্ভব দর্শন করিবে। এবং পূর্ব্ববৎ বিষ্ণু স্মরণ করিবে। অনন্তর আবার জলপাত্রে পবিত্র জল গ্রহণপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখ হইয়া প্রথমে বাম পরে দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালন করিবে। দৈবকার্য্যে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে আর পিতৃকার্য্যে দক্ষিণ মুখ হইয়া উক্তরূপে পাদপ্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য। ইহার প্রত্যেক ব্যাপারের সহিতই গুঢ়তম বৈজ্ঞানিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। এজন্য ইহা কেন করিব? উহা কেন করিব না? এরূপ 'কেন' উত্তর অন্বেষণ করিয়া এই ব্রহ্মচর্য্যবিহীন বিকৃত মস্তিষ্কে সে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষণের অধিকার চর্চ্চা না করাই আধুনিক হীনস্বাস্থ্য ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ লোক কল্যাণকর হিন্দুশাস্ত্রে যে অবৈজ্ঞানিক নিষ্প্রয়োজনীয় কতকগুলি বাজে কথা লিখিয়া শাস্ত্রের কলেবর বৃদ্ধি করেন নাই, এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাসে আপ্তবাক্যে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্র শৌচাচারের যতদূর বর্ত্তমান কালানুসারে সম্ভবপর তাহা অবশ্য করণীয়।

উক্তরূপে প্রথমে পাদদ্বয় ও পরে হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্ব্বক পবিত্র চিত্তে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া দন্তধাবন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

দন্তধাবন।

মুখবিবর পর্য্যুষিত থাকিলে মানব নিতাই রোগগ্রস্থ হয়। অতএব সযত্নে দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণপূর্ব্বক এক একটি করিয়া দন্ত বিশিষ্টভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে। যে ব্যক্তির পর্য্যুষিত দুর্গন্ধযুক্ত মুখবিবর, সে পূয় শোণিত এবং কফপিত্ত সমন্বিত কলুষিত হয়। এ নিমিত্ত দন্তধাবন অবশ্য কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানকালে দন্তধাবন জন্য যতপ্রকার ঔষধ বা সুগন্ধি চূর্ণ আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হইতেছে, তদপেক্ষা সুস্থ দন্তের পক্ষে দন্ত কাষ্ঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঋষিগণ বহুবিধ দন্তকাষ্ঠের গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে যে দ্বাদশাঙ্গুলী দীর্ঘ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল, সরল গ্রন্থিবিহীন ও অক্ষত দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করা কর্ত্তব্য। দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগটি কোমল কূর্চ্চকাকার (ব্রাসের মত) প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা দন্তবেষ্টিত মাংসে আঘাত না লাগে এমত ভাবে একটি একটি দন্ত ধীরে ধীরে ঘর্ষণ পূর্ব্বক পরিষ্কার করিবে।

মধু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সর্ষপ তৈল,

সৈন্ধবলবণ ও তেজবল্ক চূর্ণ দ্বারা দন্তকাষ্ঠের অগ্রভাগ অবচূর্ণিত করিয়া প্রত্যহ দন্ত শোধন করিবে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত দণ্ডকাষ্ঠ সকল প্রসিদ্ধ।

মধুর রস কাষ্ঠের মধ্যে মৌলকাষ্ঠ প্রশস্ত, কটু রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে করঞ্জ, তিক্ত রস-যুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে নিম্ব ও কষায় রসযুক্ত কাষ্ঠের মধ্যে খদির কাষ্ঠ প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন কাল ও দোষ এবং প্রকৃতি অনুসারে যেস্থলে যেরূপ রসবীর্য্য হিতকর তৎস্থলে সেইরূপ গুণবিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। এইরূপে দন্তধাবন করিলে মুখের বিরসতা, দন্ত বা জিহ্বার রোগসমূহ অথবা যে কোন মুখ-রোগ উৎপন্ন হইতে পারিবে না, এতদ্ভিন্ন মুখের রুচি, নির্ম্মলতা এবং লঘুতা উৎপন্ন হইবে।

আকন্দ কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিলে বীর্য্যবান হয়, বট কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে দেহের কান্তি, করঞ্জ কাষ্ঠের দন্তধাবনে জয়লাভ, পাকুর কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে অর্থ সম্পত্তি বর্দ্ধন, বদরী কাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে মধুর ধ্বনি, খদিরকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবনে মুখের সুগন্ধি, বিল্বকাষ্ঠের দন্তধাবনে অতুল ধনবান, যজ্ঞ ডুম্বুরের দন্তধাবনে বাক্‌সিদ্ধি, আম্রকাষ্ঠের দন্তধাবনে নিরোগী, কদম্ব কাষ্ঠের দন্তধাবনে ধারণাশক্তি ও মেধা, চম্পক বৃক্ষের দন্তধাবনে দৃঢ়মতি, শিরীষ বৃক্ষের দন্তধাবনে কীর্ত্তি, সৌভাগ্য ও পরমায়ু বৃদ্ধি ও আরোগ্যদেহ, আপাঙ্গ দ্বারা দন্তধাবনে ধারণাশক্তি মেধা ও বুদ্ধি এবং সুস্বরলাভ, দাড়িম্ব, অর্জ্জুন ও কুটজ বৃক্ষের দন্তধাবনে দেহ সৌন্দর্য্য, জাতীপুষ্প তগরপুষ্প ও মান্দার পুষ্পের কাষ্ঠের দন্তধাবনে দুঃস্বপ্ন বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠ।

গুবাক, তাল, হেতাল, কেতকী, বৃহত্ফল, খর্জ্জুর ও নারিকেল এই সাত প্রকার বৃক্ষকে তৃণরাজ বলে। ইহাদের যে কোনটির দ্বারা দন্তধাবনে চণ্ডাল-যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

দন্তধাবনের অযোগ্য ব্যক্তি।

গলরোগী, তালু রোগী, ওষ্ঠ বা জিহ্বা-রোগী, দন্ত ও মুখক্ষত রোগী, এবং মুখশোথ রোগী দন্তধাবন করিবে না। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, ও যাহার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হয় নাই, তাহাদের পক্ষে আর শ্বাস, কাশ, বমি, হিক্কা ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং মদরোগ, শিরোরোগ এবং পিপাসিত ও শ্রান্ত, এবং মদ্যপানে ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষেও অর্দ্দিত রোগে, কর্ণশূলে, নেত্ররোগে, নবজ্বরে এবং হৃদ্রোগে কদাচ দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে না।

কেবল সুস্থব্যক্তি উক্তপ্রকারে যে কোন হিতকর কাষ্ঠদ্বারা দন্তগুলি পরিষ্কার করিয়া লইয়া জলদ্বারা মুখ ধৌতকরতঃ জিহ্বা নির্লেখন করিবে।

জিহ্বা নির্লেখন

সুবর্ণ, রৌপ্য বা তাম্র নির্ম্মিত অথবা দন্তধাবন যোগ্য কোমলতর কাষ্ঠ চিরিয়া তদ্দ্বারা কিম্বা কোন কোমল, স্নিগ্ধ জিব ছোলা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে জিহ্বা নির্লেখন করিলে জিহ্বার মল, বিরসতা, দুর্গন্ধ ও জড়তা বিনষ্ট হয়।

দন্তধাবন ও জিহ্বা নির্লেখনান্তর শীতল ও পরিষ্কার জল দ্বারা বারংবার গণ্ডূষ ধারণ ও কুলকুচা করিয়া মুখবিবর সুন্দর রূপে

পরিষ্কার করিলে, কফ, তৃষ্ণা ও মুখগত মল নিবারিত হইয়া মুখবিবর বিশোধিত হওয়ায় দেহ স্বাস্থ্যবান হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে কফ, অরুচি, মুখগত মল ও জিহ্বা এবং দন্তের জড়তা বিনষ্ট এবং মুখের লঘুতা সম্পাদন হয়। কিন্তু বিষ, মূর্চ্ছা ও মদাত্যয় রাজযক্ষ্মা এবং রক্তপিত্ত প্রভৃতি যে কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গণ্ডূষ ধারণ করিবে না। উৎকুপিত চক্ষু বা কুপিত মলযুক্ত, ক্ষীণ, এবং রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষেও উষ্ণ জলের গণ্ডূষ ধারণ প্রশস্ত নহে।

উক্তরূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া পরে যথাসাধ্য মুখপূর্ণ করিয়া জল গ্রহণ করতঃ মুখবন্ধ করিয়া চক্ষুতে কুড়ি বার জলের ঝাপটা দিতে হয়। ইহাদ্বারা চক্ষুর জ্যোতিঃ অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাই যোগীগণের অভিপ্রায়, তাঁহারা আবার এরূপও বলিয়া থাকেন যেন মল বা মূত্রত্যাগকালীন যদি উভয় পাটি দন্ত দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া দাঁতে দাঁতে সংযুক্ত অবস্থায় ত্যাগ শেষ করা যায়, তাহাতে আমরণ কাল পর্য্যন্ত দন্ত স্থায়ী ও নীরোগ থাকে।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন।—আগামী বর্ষে নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের অধিবেশন বোম্বে নগরীতে হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদ কলেজ।—আমাদের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজটি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এবার এই কলেজের ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের পুনরুন্নতি কল্পেই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত যতগুলি আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সকলেই ইহার শিক্ষা প্রণালীর প্রশংসা করিতেছেন। প্রকৃত চিকিৎসক হইতে হইলে শল্য চিকিৎসায় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যে একান্ত কর্ত্তব্য এই কলেজের পরিচালকগণ তাহারই প্রতি সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিয়া এই কলেজের শিক্ষা প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

উৎসাহ প্রদান।—এই কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া ছাত্রবৃন্দকে উৎসাহ প্রদানের জন্য মাননীয় কর্ণেল ব্রাউন পূর্ণ এক বৎসর কালের জন্য একটি ৫৲ টাকার স্কলারসিপ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীরামপুরের মিঃ ডিক্রুজ এই কলেজের প্রথম ছাত্রকে একটি সুবর্ণ পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন আরও অনেকগুলি স্কলারসিপ এবং মেডেল এই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদান করিবেন। যে সকল মহোদয় এই কলেজের উন্নতি কল্পে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের সকল অধিবাসীরই নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ, কারণ এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ মেডিকেল কলেজটিই একমাত্র বাঙ্গালাদেশে আয়ুর্ব্বেদের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছে

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক

৪র্থ বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৭—শ্রাবণ। | ১১শ সংখ্যা।

শিশুপালন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর)

[শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বি-এ, সরস্বতী]

—:•:—

শিশুর সরলতা, পবিত্রতা সযত্নে রক্ষা করিবে। তাহাদের সম্মুখে কখনো কাহারো নিন্দা করিবে না। অনেক সময় পিতামাতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠেরা বালকবালিকাদের সম্মুখেই সমাজের অথবা দেশের নেতাদের নিন্দাবাদ করেন। ইহাতে তাহাদের প্রাণে শ্রদ্ধাহীনতা আসে এবং সর্ব্বদাই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সমালোচনাতে ও পরচর্চ্চাতে সময় যাপন করে। ইহাতে তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়। কেবল অপরের দোষের সমালোচনা করিতে করিতে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধনের দিকে মন থাকে না, চরিত্রের অবনতি ঘটে এবং যে দোষের সমালোচনা করে—সেই দোষ নিজের চরিত্রে আসে। স্বভাব "নিন্দুকে" হইয়া যায়। শ্রদ্ধাহীনতা চরিত্রের অবনতির মূল। অতএব মাতাপিতা সতর্ক হইবেন যেন সন্তানদের প্রাণে শ্রদ্ধাহীনতা না আসে। শ্রদ্ধা চরিত্রের উন্নতির মূল। শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি সন্তানদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা যাহাতে থাকে, পিতামাতা সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সন্তানগণ কেবল অপরের গুণ দেখিতে যাহাতে অভ্যস্ত হয় সেই যত্ন লইবে। পরের গুণ দেখিতে দেখিতে চরিত্র উন্নত কর, প্রাণ মহৎ হয়। সন্তানগণকে এই শিক্ষা দিবে যে প্রত্যেক মানুষেরই কোন না কোন গুণ আছে, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টি উদার হইবে, প্রত্যেক মানুষের ভিতর গুণ দেখিতে শিখিবে পরনিন্দা করা মহাপাপ ইহা

সন্তানকে শিক্ষা দিবে। বর্ত্তমানকালের যুবকদের উদ্ধত স্বভাব, বয়োজ্যেষ্ঠদের নিন্দা এবং গুরুজনে অশ্রদ্ধা দেখিয়া প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব-প্রধান যুগে সন্তানদের ভক্তিপ্রবণ করা কঠিন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নবীনা মাতাকে স্বাধীনতা ও শ্রদ্ধার সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সন্তানকে শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুকে কখনো মিথ্যা ভয় দেখাইবে না। "ঐ জুজু আস্‌ছে, ঐ ভূতে খেলে।"—বলিয়া শিশুকে মিথ্যা ভয় দেখাইলে শিশুর অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হয়। শিশুর স্বভাব ভীরু, কাপুরুষ হয়; হয়ত হঠাৎ ভয় পাইয়া মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। কিংবা চিরজীবনের জন্য স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য রোগ জন্মিতে পারে। আমাদের দেশে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে, শিশু হয়ত দুধ খাইতেছে না কিংবা কোন অন্যায় আবদার ধরিয়াছে অথবা মাতার অবাধ্য হইয়া দুষ্টামি করিতেছে, তখন মা তাহাকে এই বলিয়া নিরস্ত করেন "ঐ জুজু এলো" অথবা "অন্ধকারে যাস্‌নে, ভূতে খাবে"। এই অযথা ভয় দেখান দ্বারা শিশুর চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। এক সময়ে একটি শিশুর বাল্যকালে সে দুষ্টামী করিলে তাহার মাতা তাহাকে নিকটস্থ একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখাইয়া এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে "ঐ বৃক্ষে ভূত আছে, দুষ্টামী করিলেই তোমাকে ধরিবে"। শিশু কখনো ঐ বৃক্ষের নিকটে আর যাইত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বৃক্ষের প্রতি তাহার একটা ভীষণভাব মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। যৌবনে এই শিশু একজন বড় যোদ্ধা হয় এবং প্রৌঢ়কালে সেনাপতির পদ লাভ করেন। বহু যুদ্ধ জয়ের পর, বীরের যোগ্য প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া তিনি এক দিন মাতৃ সন্দর্শনের জন্য গৃহে যাত্রা করিলেন। বহুদিনের পর, বহু বিপদ কাটাইয়া পুত্র গৃহে আসিতেছে বলিয়া বৃদ্ধা মাতা আকুল প্রাণে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বীর পুত্র গৃহের নিকটে আসিয়া সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। তখন সন্ধ্যার আঁধার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর দুই পা অগ্রসর হইলেই পুত্র মাতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। হঠাৎ তাঁহার ঐ বৃক্ষের উপরে নজর পড়িল। আর অমনি বাল্যের সেই ভয় মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি যেন দেখিলেন যে, বৃক্ষের ঘন শাখা প্রশাখার ভিতর হইতে একটি প্রকাণ্ড বিরাটকায় মানুষ মুখ ব্যাদান করিয়া দুই বিশাল বাহু প্রসারিত পূর্ব্বক তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন। আর অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না। এত বড় বীর হইয়াও তিনি বাল্য শিক্ষার প্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বাল্য শিক্ষার প্রভাব এইরূপ। সৎশিক্ষা দাও কিংবা অসৎ শিক্ষা দাও, যে ভাবেরই শিক্ষা দাও না কেন, তাহা একেবারে পাথরে খোদাই হইয়া যাইবে। প্রত্যেক মাতা ইহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া সন্তানের প্রাণে সৎ, মহৎ, উন্নত, উদার, ধর্ম্মপূর্ণ, সাহস ও বীরত্ব পূর্ণ ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবেন।

সন্তান অপরাধ করিলে তাহার শাস্তি স্বরূপ তাহাকে কখনো আহার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে না কিংবা কোন অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিবে না। ইহাতে শিশু

অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে, কিংবা অন্ধকারে হঠাৎ ভয় পাইয়া স্নায়ুদৌর্ব্বল্য রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। তোমার নিজের temperর উপর যেন সন্তানের শাস্তি নির্ভর না করে। আজ যে দোষ করিয়া শিশু কোন শাস্তি পাইল না, কারণ তোমার চিত্ত আজ প্রসন্ন, ফলে তোমার চিত্ত কোন কারণে অপ্রসন্ন বলিয়া শিশু সেই দোষের জন্য যদি শাস্তি পায় তবে তাহাতে তাহার কুশিক্ষা হইবে। শিশু বুঝিতেই পারিবে না যে, সে কখন্ অন্যায় করিতেছে আর কখন্ করিতেছে না। বিশেষ কোন গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সন্তানকে কখনো প্রহার করিবে না। অপরাধ করিলে তাহাকে ধমক দিয়া কিংবা তাহার প্রিয় বস্তু কাড়িয়া লইয়া শাস্তি দিলেই যথেষ্ট শাসন করা হয়। কথায় কথায় প্রহার করিলে শিশু আর প্রহারকে গ্রাহ্য করিবে না, তখন আর সে কোন শাস্তিকেই ভয় করিবে না।

শৈশবে যে অভ্যাস হয়, আজীবন তাহা থাকিয়া যায়। অতএব মাতা শৈশব হইতেই শিশুকে সমুদয় সদ্ অভ্যাসে অভ্যস্ত করাইবেন Habit is second nature সদ্ অভ্যাস হইলে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের কর্ত্তব্য গুলিও অতি সহজেই সম্পাদন করিতে পারিবে। তাহাকে ভাল করিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হইবে না।

মাতা তাঁহার পুত্রকে শৈশব হইতেই তাহার ভগ্নীকে ভালবাসিতে ও সম্মান করিতে শিখাইবেন। বড় ভগ্নী হইলে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে, ছোট ভগ্নীর গায়ে কখনো হাত তুলিবে না, তাহাকে যত্ন করিবে ও ভালবাসিবে। ছোট ভগ্নী হয়ত তাহারি কোন একটি জিনিস লইবার জন্য কিংবা তাহার হাতের খাবার খাইবার জন্য কাঁদিতেছে, জননী তখনি পুত্রকে বলিবেন, "তোমার ছোট বোন কাঁদ্‌ছে, ওকে দাও। বোনকে আদর কর্‌তে হয়"। পুত্র সে আদেশ পালন করিল কিনা দেখিবেন। গৃহে পুত্র যেন সর্ব্বদা দেখে যে, মাতাই সেই গৃহের একমাত্র রাণী, পিতাও তাঁহার ইচ্ছা মানিয়া চলেন। তাহার যেমন আদর ভগ্নীদিগেরও ঠিক তেমনি আদর। সে যেমন শিক্ষা পাইতেছে ভগ্নীরাও ঠিক তেমনি শিক্ষা পাইতেছে। সে যেমন গৃহে ব্যবহার পাইতেছে ভগ্নীরাও তেমনি ব্যবহার পাইতেছে। শৈশবে গৃহের এইরূপ শিক্ষা হইতেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সে বাহিরের সমগ্র মাতৃজাতিকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়। ইহা তাহাদের গৃহশিক্ষার ত্রুটি। গৃহে নারী জাতির অসম্মান দেখিয়া দেখিয়া তাহারা নারীর প্রতি শ্রদ্ধা হারায়। বর্ত্তমান যুগের নবীনা মাতার উপর তাঁহার পুত্রদিগকে নারীজাতির শ্রদ্ধাশীল করিবার গুরুভার পড়িয়াছে। তাঁহারা এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেশের কলঙ্ক দূর করুন।

গৃহই চরিত্র গঠনের সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র স্থল। মাতা সেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। তিনি যেমন ভাবে গৃহ গড়িবেন, সন্তান সন্ততি তেমনি হইবে। যে গৃহ প্রেম ও কর্ত্তব্যপালনে পূর্ণ, যেখানে হৃদয় ও মস্তিষ্ক—বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করে, যেখানে প্রাত্যহিক জীবন ধর্ম্মভাব ও সাধুতায় পূর্ণ,

যেখানকার শাসন সদয়তাপূর্ণ, প্রেমময় ও ন্যায়সঙ্গত, সেই গৃহ হইতে যে সব সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ, ধর্ম্মভীরু পুরুষ ও নারী উদ্ভূত হইবে, তাহারা নিজেরা জীবন ক্ষেত্রে সোজা সরল পথে চলিয়া আপনাকে সংযত রাখিয়া যেমন সুখী হইবে, তেমনি সমাজের ও দেশেরও মঙ্গল সাধন করিবে।

শৈশব হইতে সন্তান সন্ততিদিগকে সর্ব্বদা সুন্দর চিত্র, তানলয় সমন্বিত সুমিষ্ট সঙ্গীত, সুন্দর পুষ্প, মহৎ লোকের ধর্ম্মভাব পূর্ণ প্রতিকৃতি, গৃহের পবিত্র বাতাসের মধ্যে রাখিবে। তাহা হইলে একদিকে তাহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইবে এবং মনও উন্নত, পবিত্র এবং মহৎভাবে পূর্ণ হইবে।

শিক্ষায় ব্রহ্মচর্য্য।

[কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কাব্যতীর্থ-কবিভূষণ]

আমরা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার-কৃপায় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান দুর্লভ মানব জনম লাভ করিয়াছি। জানিনা, কত যুগযুগান্তর, কত সহস্র জন্ম ভোগ করিয়া কত কৃচ্ছ্রতম সাধনার ফলে সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিত, সমস্ত বাঞ্ছিত ফলদায়ী এই জীবনকে অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছি, এই জীবনেই মরজগতে অমরত্ব লাভ করতঃ জীব অক্ষয় অসীম ব্রহ্মানন্দ সুধা পান করিতে অধিকারী হয়। অপরাপর জীবগণ আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবন যাত্রার উপযোগী স্বভাব সিদ্ধ ব্যাপার সমাধানেই জীবন পর্য্যবসিত করে এবং ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি সম্পাদন করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করতঃ তৃপ্তিলাভ করে। কিন্তু মানব ইহাতে পরিতৃপ্ত নহে। প্রাণ-রক্ষার জন্য অবশ্য করণীয় বলিয়াই আমরা ঐ সমস্ত ব্যাপারে প্রবৃত্ত থাকি এবং ঐ প্রবৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট সাময়িক মাত্র। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিশীলনে আত্মোৎকর্ষলাভই মানব জীবনের সার লক্ষ্য। এইলক্ষ্য সম্পাদন বিষয়ে যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পারেন তিনিই সেই পরিমাণে প্রকৃত মনুষ্যত্বের গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। বড়দুঃখেই কবি বলিয়াছেন—

"জন্মেদং বন্ধ্যাতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্তচিন্তামণির্ময়া"॥

সাংসারিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকিয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মোৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিলে মনুষ্যের পক্ষে এতদপেক্ষা অধিক অনুতাপের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। অমূল্য রত্ন বিনিময়ে কাঁচের খেলনা কোন্ মূর্খ কিনিতে ইচ্ছা করে? যে জীবন রত্নের সদ্ব্যবহারে মানুষ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত তৃপ্তিময় ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন অথবা জড় জগতের বিচিত্র ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের বিস্ময়কর কার্য্য-কারণ নির্ণয় ও নানাবিধ রহস্যময় নব নব তত্ত্বের উদ্ভাবন করতঃ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি-পীযূষপানে বিভোর হইয়া ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে

চিরস্থায়ী চিরকল্যাণকর রূপে পরিণত করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বহু জন্মান্তরীয় দুর্লভ সাধনার ফল স্বরূপ মানব জনম লাভ করিয়া কোন্ মূর্খ তাহাকে ব্যর্থ ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য অপব্যয়িত করিতে ইচ্ছাকরে?

সাধারণতঃ জীবমাত্রই দুঃখের শান্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য লালসান্বিত, বস্তুতঃ এতদুভয় ব্যতীত কাহারও কোন লক্ষ্য আছে বলিয়া অনুমান করা যায় না, তবে রুচি অথবা বোধ শক্তির তারতম্য অনুসারে সুখ বা দুঃখ সম্বন্ধে মতামত থাকিতে পারে। যাহা ব্যক্তি বিশেষের সুখকর, হয় ত তাহা অপরের পক্ষে ক্লেশ বা বিরক্তিজনক। কিন্তু এ যুক্তির অনুসরণ দ্বারা সুখ বা দুঃখের স্বরূপ নির্ণেয় হইতে পারে না। তুমি আমি বা অপর কোন ব্যক্তি কু আসক্তির দোষে অসদাচরণে ক্ষণিক সুখ বোধ করিলেই উহা সুখ শব্দের প্রকৃত প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। যদি তাদৃশ সুখ সম্ভোগের ফলে উত্তরকালে কোন দুঃখ অথবা কার্য্যহানি ঘটে (অর্থাৎ জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য সাধনের পক্ষে কদাপি অন্তরায় স্বরূপ হয়) তবে এতাদৃশ সুখ—সুখ নহে, প্রত্যুত দুঃখ বলিয়াই পরিগণিত। ফলতঃ দুঃখ সম্পর্ক শূন্য হৃদয়ের তৃপ্তিকেই সুখ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। এই সুখই প্রকৃত পুরুষার্থ। ইহার জন্যই মানব সংসারযাত্রার ছলে কত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন। নিজ কৃতকর্ম্ম সাহায্যে আত্মতৃপ্ত পুরুষই জগতে ধন্যবাদার্হ, সর্ব্বজন প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন।

এই প্রকার আত্মতৃপ্তিতে স্বার্থপরতার লেশও থাকিতে পারে না, কেননা উহা নিজের অপেক্ষা দেশের ও সমাজেরই অধিক কল্যাণকর। একজন আদর্শ স্থানীয় মহাপুরুষের আবির্ভাবে একটা সমগ্র দেশ কত উন্নতি ও গৌরব প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল নহে। পরিতাপের বিষয় আমরা বহুদিন হইতে সদাচার-পথচ্যুত হইয়া ক্রমেই অধঃপতিত হইতেছি। কর্ত্তব্যবিশ্বাসে অকর্ত্তব্য বিধানে রত হইয়া তজ্জনিত বিষময়-পরিণাম ফল ভোগ করিতেছি। শিক্ষাভ্রমে কুশিক্ষা সম্ভূতমোহে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছি। গন্তব্যপথভ্রমে কণ্টকাকীর্ণ বিপথে চলিত হইয়া বিপন্ন হইতেছি। আমাদের যাহা কিছু গৌরবের, সুখের, গর্ব্বের বিষয় ছিল, অজ্ঞতাবশে সে সমস্ত পদদলিত করিয়া পরপদলেহন বৃত্তিকেই জীবনের সার ও চরম লক্ষ্য স্থির করিয়াছি।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় চিন্তা করিলে সমগ্র সভ্যজগতই অধঃপাতের চরমসীমা ও মনুষ্যত্বের অস্বাভাবিক বিপর্য্যয় দেখিয়া বিস্ময়বশে স্তম্ভিত হইবেন। আমরা পরের সত্তায় সত্ত্ববান্, পরের শক্তিতে শক্তিমান্, পরের কর্ত্তব্য সম্পাদনে কর্ত্তব্য পরায়ণ, এক কথায় আমাদের নিজস্ব বা নিজত্ব বলিয়া গৌরব দেখাইবার কিছুই নাই। কলের পুতুলের ন্যায় যন্ত্র চালিত হইয়া চালকের অভিপ্রায় অনুসারে কখন হাসিতেছি, কখন নাচিতেছি, কখন কাঁদিতেছি। আবার চালকের ইচ্ছাক্রমে কখনও বা নিষ্ক্রিয় নিস্পন্দ-ভাবে অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিয়া জীবন সার্থক করিতেছি! অধিক কি বলিব, স্নান, আহার, বেশ, ভূষা, চলন, হাস্য, ভাষ্য উপবেশনাদি ব্যাপারেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য

দূরীভূত হইয়াছে। জানিনা, এই ভীষণ কাল-প্রবাহ আমাদিগকে আরও কতকাল কত অধঃপাতের দিকে চালিত করিবে? অথবা কোনও অলৌকিক প্রভাব সম্পন্ন মহাপুরুষের অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমরা পুনর্ব্বার নিজের নিজত্ব বুঝিতে সমর্থ হইব।

এই সার্ব্বজনীন অবনতি অজ্ঞাত সূত্রে ক্রমশঃই আমাদিগকে অধঃপাতিত করিতেছে অথচ আমরা এতই মোহাচ্ছন্ন যে নিজের দুর্গতির জন্য পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াও নিজেকে শিক্ষিত ও উন্নত বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছি না। বিগত ইউরোপীয় মহা সমরের জন্য আজ আমরা কি দুর্দ্দশাপন্ন তাহা সর্ব্বসাধারণেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এই সমর যদি আর কিছুকাল থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় অচিরাৎ সমগ্র ভারতব্যাপী হাহাকার উপস্থিত হইত। অথচ এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আজ জাপান ব্যবসা বাণিজ্যের মাহেন্দ্রক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া নানা উপায়ে অজস্র অর্থ সঞ্চয় করিয়া দেশকে ধনশালী এবং সর্ব্বাংশে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে। যে সুযোগ আজ জাপান পাইয়াছে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত কেন? কে আমাদিগকে নিজদেশের—নিজ-সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পথে বাধা দিতেছে? পাঠক! একটু চিন্তা করিলেই এই প্রশ্নের মীমাংসা অতি সহজেই করিতে পারেন। আমরা নিজজাতীয়তার গৌরব পদদলিত করিয়া পরকীয় সামাজিকতা স্রোতে গাত্র ভাসাইয়া দিয়াছি। যাহা নিজস্ব ছিল তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি, অথচ যাহা পাইব বলিয়া দুরাশা করিয়াছিলাম তাহাও পাইতেছিনা, সুতরাং এ দুর্দ্দশা আমাদের স্বকৃতব্যাধি। নীতিবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন "ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি"। তাই এখন আমরা আমাদের নিশ্চিত অনিশ্চিত যা কিছু সম্পত্তি ছিল সমস্তই হারাইয়া এখন অতীত বিষয়ের বৃথা অনুশোচনায় অনুতপ্ত হইতেছি। কিন্তু এই অনুতাপ যদি আন্তরিক হইত, যদি আমরা অনুতপ্ত অবস্থাকে স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে গ্রহণ করিতাম, তবে বোধ হয় উহা বৃথা হইত না। অবশ্যই এতদিনে কোন একটা প্রতিবিধানের পথ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতাম। অভাবের তাড়নায় মর্ম্মাহত হইয়া দেশের, সমাজের, আত্মীয়-স্বজনের দুর্দ্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সময়ে সময়ে চপলার চমকের মত প্রতিবিধানকল্পে উদ্বুদ্ধ হই বটে, কিন্তু যোগ্যতার অভাবে সে উদ্বোধন উন্মত্তের প্রলাপবৎ কার্য্যকারী হয় না। শিক্ষাবিপর্য্যয়ে আমরা দৈশিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি, চির প্রচলিত কর্ত্তব্যপথ ভ্রষ্ট হইয়া অপথে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ঘুরিতেছি, অথচ আত্মভ্রান্তি বুঝিতে পারিতেছি না। পাশ্চাত্য উন্নত প্রণালীর শিক্ষায় আমরা নিজেকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিতেছি, কেহ বৈজ্ঞানিক হইয়া রহস্যময় অভিনব প্রাকৃতিক তত্ত্বের আবিষ্কার দ্বারা বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করিতেছি, কেহ বা ব্যবহারাজীব ভাবে স্বকীয় প্রতিভার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া যশস্বী ও অগণিত ধনশালী হইতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেই আমাদের দিন দিন অধিকার বাড়িতেছে

এবং তাহাতে অর্থ সমাগমেরও সুযোগ ঘটিতেছে। কিন্তু এই শিক্ষাগৌরব বা ধন-সমাগমে আমাদের দেশের অথবা সমাজের প্রকৃত উপকার অথবা অপকার সাধিত হইতেছে তাহাই এখন পর্য্যালোচনার বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধিত প্রসারে দিন দিন আমাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভ্রান্তশাস্ত্রাভ্যাস লোপ পাইতেছে। সনাতনী সর্ব্বসম্পত্তিময়ী সংস্কৃত ভাষা আজ হতাদরা হইয়া মৃতপ্রায় নামমাত্রে অবশিষ্ট আছে। সেই সিদ্ধ মহাত্মা মহর্ষিগণের, সিদ্ধান্ত জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ক্রিয়াকলাপের শিক্ষাপ্রদানে সমগ্র বিশ্ববাসীর আদর্শ স্থল, বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, জ্যোতিষ, গণিত, কাব্য, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি পবিত্র শাস্ত্রনিচয় আজ আলোচনাভাবে নিপাতোন্মুখ। আজ আমরা সেক্‌স্‌পিয়র, মিল্‌টন রচিত কাব্য অধ্যয়নকরতঃ কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের কাব্য সমালোচনা করিতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কি হইতে পারে? বিজাতীয় শিক্ষা যতই উন্নত হউক তাহা কখনই অন্য জাতির পক্ষে দেশ ও সমাজের গৌরব বর্দ্ধক হয় না। তাহাকে আদর্শ করিয়া শিক্ষিত হওয়া অপ্রার্থনীয় নহে, কিন্তু তাহার মোহে মুগ্ধ হইয়া তন্ময় হওয়া নিতান্তই কাপুরুষের লক্ষণ। শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও নিজের সমাজকে, নিজের দেশকে উন্নত কর, অনুসন্ধান দ্বারা আমাদের অগাধ শাস্ত্রসিন্ধু হইতে জ্ঞান বিজ্ঞান রত্নে ভূষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে সমুজ্জ্বল কর,—দেখিবে, যে শিক্ষার জন্য পরের দুয়ারে ভিখারীর মত ঘুরিতেছ তদপেক্ষা অনেক উন্নত শিক্ষণীয় বিষয় আমাদের শাস্ত্রে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনায় জড়জগতের অনেক চমকপ্রদ ব্যাপার আবিষ্কৃত হইতেছে সত্য, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখ এই গবেষণায় যথার্থরূপে দেশের বা সমাজের কি উপকার সাধিত হইতেছে? যদি কিছু হইয়া থাকে তাহাতেই বা আবিষ্কর্ত্তাদিগের কোন স্বাধীনতা আছে কি না? ভারতীয় উপাদান সম্ভার সাহায্যে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যদি এই আবিষ্কার হইত তবে চিরদিনের জন্য ইহা আমাদের একটী সম্পত্তিরূপে উপযোগী হইয়া থাকিত।

পরিতাপের বিষয় আমরা বুদ্ধিমোহে পরকে আপন করিয়া আপনাকে পর করিতেছি। পরের সাহায্য লাভে উত্থান করিব বলিয়া স্বইচ্ছায় খঞ্জ সাজিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু কোন দেশেই কাহারও পরের দ্বারা উদ্ধার হয় না। যদি বাস্তবিক মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ থাকে,—যথার্থই নিজেকে, দেশকে, সমাজকে সমৃদ্ধি ও গৌরবান্বিত করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে জাতীয়ভাবে দেশের সেবা করিতে হইবে। তজ্জন্য পরের ভাষা, রীতি, নীতি প্রভৃতি শিক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে—তাহা আত্মশিক্ষার উপকরণ মাত্র,—প্রাণ নহে। আমরা বুদ্ধি ভ্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষাস্রোতে অবশভাবে গা ঢালিয়া দিয়াছি,—পরিণামে কোন্ দশায় উপনীত হইব তাহা চিন্তা করি নাই, সুতরাং অবিবেকীর যাহা ধ্রুবফল তাহাই ভোগ করিতেছি।

ইংরেজ আমাদের রাজা, সুতরাং নানা

কারণে আমরা রাজভাষা শিক্ষায় বাধ্য। বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ, ব্যবসায় বিভাগ, বাণিজ্য-বিভাগ স্থাপত্য বিভাগ প্রভৃতি যে সমস্ত অবলম্বনে দেশীয় সহস্র সহস্র লোকের জীবিকা সম্পন্ন হইতেছে সে সমুদয় স্থলেই ইংরাজী ভাষা প্রচলিত। ইংরাজীভাষা আজ ভারত-বাসীদের পরস্পর পরিচয়ের সাধারণ ভাষা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ ভাবে পরস্পরের পরিচয়ের সুবিধা আমরা পূর্ব্বকালে কখনও প্রাপ্ত হই নাই, সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা যে দেশবাসীর একান্ত আবশ্যক তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিখিতে হইলেই যে ইংরেজ হইতে হইবে, দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি পদদলিত করিতে হইবে, এ শিক্ষা অতি দূষণীয়—এই দোষেই আজ আমরা সমগ্র পৃথিবীমধ্যে অধঃপতিত ও পৌরুষহীন বলিয়া অবজ্ঞাত।

তাই বলিতেছি স্বদেশী ভ্রাতৃগণ! একবার অনুসন্ধানতৎপর হও, দেখ আমরা কোন্ উপায় অবলম্বনে সেই নিত্য শান্তিময় সনাতন শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজেকে ও দেশকে উন্নত করিতে সমর্থ হইব। কিসে এই নিত্য দারিদ্র্যের করাল কবল হইতে দুর্গতি-পীড়িত দেশকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইব। এরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আর সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। দেশের জন্য, সমাজের জন্য বদ্ধপরিকর হও, উন্নত লক্ষ্যের অনুসরণ পূর্ব্বক হৃদয়ক্ষেত্রকে মার্জ্জিত করতঃ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হও, নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

আমাদের দেশে বিদ্যার্জ্জন সময়ে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের বিধি চিরকালই ব্যবস্থিত ছিল, মানস ক্ষেত্র হইতে কণ্টকবৃক্ষস্বরূপ বিষয়ান্তরের উচ্ছেদ করাই ঈদৃশ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। জমীকে উর্ব্বর করিয়া অধিক শস্যোৎপাদক করিতে হইলে যেমন তন্মধ্যস্থ আবর্জ্জনাদি উৎপাটন করিতে হয়, হৃদয়কেও সুপ্রশস্ত ও বিদ্যাসম্পন্ন করিতে হইলে তেমনি সংযম-প্রভাবে তন্মধ্য হইতে বিষয়ান্তর চিন্তা দূর করিয়া দিতে হয়। সংযমই শিক্ষার নিদান। ইহা ব্যতীত কোন শিক্ষাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। সংযমে হৃদয়ের একাগ্রতা আনয়ন করে এবং একনিষ্ঠহৃদয় সত্বর ও সম্পূর্ণভাবে শিক্ষণীয় বিষয় অধিকার করিতে সক্ষম হয়।

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে এই সংযমের সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রহ্মচর্য্য দূরের কথা, আজকাল শিক্ষাকালে বরং তাহার বিপরীত ভাবই অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মসমন্বয়, দৈশিক রীতিনীতির দোষগুণের সমালোচনা, স্বায়ত্ত-শাসন-গবেষণা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি আজকাল ছাত্রদের মানসক্ষেত্রে অটল আসন সংস্থাপন করিয়াছে। প্রাচীনকালে অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইত। অনন্যমনা হইয়া আচার্য্যের উপদেশ ও আদেশের অনুবর্ত্তন করাই শিক্ষার্থীর জীবনব্রত ছিল, শিষ্যগণ শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতিরিক্ত বিষয়ান্তর চিন্তার সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হইত না, কারণ অবশিষ্ট সময়ে আচার্য্যদেবের নিকট বা পরস্পরে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনায় অতিবাহিত করিতে হইত। কিন্তু এখন

আর ছাত্রদের সে বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। মাতৃ ক্রোড় ত্যাগ করিতে পারিলেই বালক স্বাধীন হইল। সম্পূর্ণ শিক্ষা কালটী যদৃচ্ছা-ক্রমে যাপন করার জন্য পরিণামে একটা কিম্ভূত কিমাকার শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ঐ বালক কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সে হাকিমই হউক, আর ব্যারিষ্টারই হউক বা পদগৌরবে যত বড় উর্দ্ধাসনেই আরোহণ করুক, কিন্তু তাহার শিক্ষার ত্রুটীর জন্য পুরুষাকারের অভাব এ জীবনে আর পূর্ণ হইবার নহে। চিত্তের স্থিরতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাহার নিকট দুর্লভ। অসংযতভাবে উচ্ছৃঙ্খল অন্তঃকরণে যে শিক্ষাবীজ বপন করা হইয়াছে তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে। যদি কদাপি কোনস্থলে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে সে জন্মান্তরার্জ্জিত বিশেষ সুকৃতির ফলেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাদৃশ স্থল অতি বিরল। ছাত্রজীবন স্বভাবতঃই চাপল্য পূর্ণ, বাধ্যতামূলক শাসনের বহির্ভূত থাকিলে কখনই অভিনিবেশ সহকারে বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিতে চায় না। সময়ে সময়ে কেহ কেহ প্রবল প্রতিভা বলে এই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইলেও শিক্ষাকালীন অসংযত-ভাবে অবস্থানের জন্য প্রাকৃতিক উন্নতিলাভে বঞ্চিত হয়, সুতরাং তাদৃশ শিক্ষার কোনই গৌরব নাই। যে বিদ্যার্জ্জনে মানব বিনয়, লোকহিতৈষিতা, নিরভিমানতা অর্জ্জন করিতে অক্ষম তাহা মুখ্যফল বর্জিত, অসার। এই জন্যই এখন আমরা ঘরে ঘরে প্রচুর কৃতবিদ্য দেখিতে পাই, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত বিদ্বান্ অতি অল্পই দেখা যায়। বিদ্যা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রসার। জ্ঞানের প্রসারে মানুষ আত্মবোধ লাভ করতঃ যথার্থ মনুষ্যত্ব পাইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশে অতি পুরাতন কাল হইতে জ্ঞানোন্মুখী বিদ্যাই আদৃতা হইয়া আসিতেছিল। অথচ তাহাতে কর্ম্ম শিক্ষা বা জীবিকার্জ্জন স্বতঃসিদ্ধরূপে সম্পাদিত হইত। জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে হইলেই তাহাকে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আবার আর্থিক সাহায্য ব্যতীত কেহই কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেনা। সুতরাং এখন যে কর্ম্ম ও অর্থ বিদ্যার্জ্জনের মুখ্য ফল বলিয়া পরিগৃহীত, প্রাচীনকালে তাহা শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র ছিল। অথচ এই অসার ফলের জন্য কেহই বিদ্যার উপাসনা করিত না। আবার সেইভাবে শিক্ষার গতি পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আমরা কখনই কোন প্রকারে উন্নত হইতে পারিব না। সেই ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ব্যতীত উন্নত বিদ্যার্জ্জনের আশা অসম্ভব।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায়।

[প্রাপ্ত]

(শ্রীরমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

ভাবিয়া পাই না যে, হিন্দুসর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার কেন উন্নতি হয় না। অনেক দিন হতেই ভাবি, কিন্তু কিছুতেই মীমাংসা ঠিক করিতে পারি না। অনেক বিখ্যাত কবিরাজ মহোদয়গণের প্রবন্ধ পাঠ করি, চিকিৎসক মহোদয়গণের চিকিৎসা অর্থাৎ ব্যবস্থা দেখি, রোগ পরীক্ষা দেখি, ঔষধ নির্ব্বাচন দেখি, চিকিৎসা বা রোগ নির্ব্বাচনের সাফল্য দেখিয়া কিন্তু তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। অনেক সময়ে নিজেই "ইদমেব তত্ত্বং"—এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হয় না ভাবিয়া লই, কিন্তু পরক্ষণেই "ন জাতু কামং কামা না সুরাভোগেন শাম্যতি" এই ভগবদ্ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হওয়ায় আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়। আজ অনেক দিনকার দুঃখের কাহিনী—উন্মত্তের স্থির সিদ্ধান্ত, চিন্তান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই লিখিয়া ফেলিলাম।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি চিকিৎসার সাফল্যে, "তেষাং সুখৈষিণাং রোগোপশমনার্থং আয়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছামঃ।" ব্যাধির তত্ত্বজ্ঞান, এবং রোগোপশমই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি। নানাবিধ উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া, শ্বেত কৃষ্ণ অশ্বযানে আরোহণ করুন বা প্রাসাদ শিখরবাসীই হউন বা মোটর বিহারীই হউন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি তাহাতে নির্ভর করে না—ইহাই আমার ধারণা।

অনেক ভাবিয়া আমি ইহাই ঠিক করিয়াছি যে, আমাদের দেশে যখন দেখিব অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্ব্বেদের শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, ভূত্য, অগদতন্ত্র প্রভৃতির চিকিৎসায় পারদর্শী আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকের অপ্রতুল নাই, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় তিরোহিত হইয়াছে।

এমন বহু চিকিৎসক বঙ্গদেশে আছেন—যাঁহারা শাস্ত্রের ধারেন না, শারীরতত্ত্ব, শিরা, স্নায়ু, মর্ম্ম, অস্থি স্থিতির জ্ঞানলাভ করেন নাই, অথচ শল্য চিকিৎসায় কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন, আবার এমনও বহু আছেন, যাহারা, কাশীরাজ সদৃশ বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ, রোগ নির্ব্বাচনে অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন, কিন্তু সামান্য একটী বিস্ফোটক হইলেই তখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কিম্বা একটী জ্বরের রোগী চিকিৎসা করিতেছেন তাহার একটী পক্কাপক্ক শোথ চিকিৎসা করিতে হইলেই অন্য চিকিৎসার আশ্রয় লইতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার যে উন্নতি হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। এখন অনেক চিকিৎসকও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা পাণ্ডিত্যে সুরাচার্য্যকল্প, কিন্তু স্নেহপাক—এমন কি তৈল, ঘৃতের মূর্চ্ছাপাকটি পর্য্যন্ত জানেন না, সামান্য রস, গন্ধক শোধন করিবার সময়েও কর্ম্মচারীর উপদেশ অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা যে আয়ু-

র্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতি হইবে না ইহাও ধ্রুব সত্য কথা। যখন দেখিব এই সমস্ত অভাব দূরীভূত হইয়া আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত চিকিৎসক যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষারাগ্নি প্রণিধানে স্নেহ স্বেদাদি কার্য্যে সব্যসাচী তুল্য কর্ম্মী হইতেছেন তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

"এতদ্ব্যবশ্য মধ্যেয় মধীত্যচ কর্ম্মাপ্যবশ্য-
মুপাসিতব্যং।

"যস্ত কেবল শাস্ত্রজ্ঞঃ কর্ম্মস্ব পরিনিষ্ঠিতঃ।
সমুহ্য আতুরং প্রাপ্য প্রাপ্যভীরুরিবাহবং॥

"যস্ত কর্ম্মস্ব নিষ্ণাতো ধার্ষ্টোৎশাস্ত্র-
বহিষ্কৃতঃ।
স সৎসু পূজাং নাপ্নোতি বধর্হাইতি
রাজতঃ॥

উভাবেতা বনিপুণা বসমর্থৌত্ব কর্ম্মণি
অর্দ্ধবেদ ধরাবেতারেকপক্ষা বিব দ্বিজৌ॥
স্নেহাদিস্বনভিজ্ঞোয়শ্ছেদ্যাদিষু চ কর্ম্মসু।
স নিহন্যিজনং লোভাৎ কুবৈদ্যো
নৃপদোষতঃ॥

সহৃদয় পাঠকমাত্রেরই ঋষি বাক্যের অনুশাসন ফল প্রতীয়মান হইতেছে। তাই বলি, যখন দেখিব অমরবৈদ্য অশ্বিনীকুমার, মহবৈদ্য চরক প্রভৃতির আদর্শে, প্রাচ্য-প্রতীচ্য পণ্ডিতের নিকট অবিরুদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষা লাভ করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসক নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

যখন দেখিব ঋষি বাক্যের ফলশ্রুতি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে প্রত্যেক ঔষধের বা বনৌষধের ক্রিয়া প্রত্যক্ষীভূত হইয়া শিক্ষার্থীগণকে আনন্দিত করিতেছেন, তখনই বুঝিব—ইহার উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

কোন একটী ঔষধের ফলশ্রুতি আছে,—
"জরমষ্টবিধং হন্তি কাসশ্বাস হলীমকৌ
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্লীহগুল্মাদিকানিচ"

ঋষি বলিয়াছেন,—এই ঔষধে উক্ত ব্যাধি সমূহ বিনষ্ট হইবে। শিক্ষার্থী, বিদ্বর্গী, গুরুপদেশে যাঁহাই শিখুন, সেকথা পরে বলিতেছি,—কিন্তু অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া, যাঁহারা ইহাতে জীবিকার্জ্জন করেন, তাহারাই কি বুঝেন তাহাই কিন্তু প্রথম বিবেচনার বিষয়। এই ঔষধটী জরাধিকারে আছে, কিন্তু "যে কেবল গুল্মরোগী তাহাকে এই ঔষধের ফলশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিবেন কি না? অথবা জ্বর, কাস, শ্বাস, হলীমক, শোথ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, গুল্ম এ সকলের একত্র সমাবেশ থাকিলে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ নির্ব্বাচন না করিয়া যদি এই একটী ঔষধের উপর নির্ভর করেন, তাহাতেই সুব্যবস্থা হইবে কিনা? অথবা উক্ত ব্যাধি সমষ্টির ব্যষ্টিক্ষেত্রেও ঐরূপ হইবে কিনা? না হইলে ঋষিরা কি বিজ্ঞান বহির্ভূত অজ্ঞের মত কতগুলি ফলশ্রুতি দিয়া "পঞ্চমীর ব্রতের সপ্তরীপেশ্বরের পত্নীত্বলাভের ("পিবনিম্বং প্রদাস্যামি বালস্তে থণ্ড লড্ডুকান্") মত প্রলোভন দেখাইয়াছেন। যখন বুঝিব, এই সমস্ত আর্ষবাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া হিতমিত ঔষধের দ্বারা, পল্লীতে পল্লীতে সুচিকিৎসক বিরাজ করিতেছেন, তখনই বুঝিব আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির অন্তরায় দূর হইতেছে।

সংগৃহীত পুস্তকের জ্বরাধিকারের লক্ষ্মী-বিলাসে লেখা আছে "অস্য প্রসাদাৎ ভগবান্ লক্ষ্মণারীযুবল্লভঃ।" বাস্তবিক লক্ষ্মীবিলাসের উপাদান মধ্যে বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, শতমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বৃদ্ধদারক প্রভৃতি বাজীকারক ও রসায়ন দ্রব্যের সমষ্টি মিশ্রিত। এরূপ অবস্থায় ইহাতে ক্ষয় নিবৃত্তি করিয়া ইহা যে শ্রেষ্ঠ বাজীকারক ঔষধ হইবে এবং বয়ঃ সংস্থাপন, মেধা ও বলবৃদ্ধি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু বলুন ত? কোনও চিকিৎসক মহোদয় কি ইহাদ্বারা ঐরূপ একটী রোগ আরোগ্য করিয়া, সম্পূর্ণ বা আংশিক ফললাভ করিয়াছেন? অনুমান করি কেহই করেন নাই। করিলেই বা কোনও শিক্ষার্থীকে উপদিষ্ট বা যোগ্য করিয়াছেন কি? অধিক কি অনেকে হয় ত বংশপরম্পরা প্রচলিত কোন কোন বনৌষধি দ্বারা অনেকে রোগ বিশেষে যে ফল লাভ করিয়াছেন বা নিজেদের গবেষণা দ্বারা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ফললাভ করিয়াছেন তাহার গলিতাংশও কি কাহাকে দান করিয়াছেন? বরং এমনই গোপনে, উহা রক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে নিজের পুত্রও পরিণামে পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়। ইহার উদাহরণ আমি বহু জানি, সময়ে প্রকাশও করিব। এই জন্যই অতি দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির যে সকল অন্তরায় আছে তাহার মধ্যে ইহাই বিশিষ্ট কারণ।

ভারতের এমনই দুর্দ্দিন উপস্থিত যে, আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ অগদতন্ত্রের বিষ চিকিৎসা দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এই বিষ বৈদ্যের লোপ ও আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির একটি বিশেষ অন্তরায়।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ দূর হিমালয়ের উপত্যকা অধিত্যকায় পরীক্ষা-লব্ধ কোন একটী বনৌষধি লিপিবদ্ধ করিয়া যাহাতে সমগ্র পৃথ্বীবাসীর উপকার হয়, তজ্জন্য ভাষা হইতে ভাষান্তরে উহার পরিচয় প্রকাশ এবং তাহার প্রযুজ্য অংশ তরল বা চূর্ণ বা বটী প্রভৃতি নানারূপে প্রস্তুত করিয়া বিতরণ এবং বিক্রয় দ্বারা "তদিদং স্বর্গং যশস্য মায়ুষ্যং বৃত্তিকরঞ্চেতি"—বাক্যের স্বার্থকতা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। এমন কি, আমাদের দেশীয় পদদলিত, দূরীকৃত জঞ্জাল রাশি হইতেও সংগৃহীত বনৌষধি বিদেশের বাহ্যিক চাকচিক্যে ভূষিত হইয়া আমাদেরই, পল্লী-বিপণীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, আর আমি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসক হইয়া, পাড়ায় আমার হাতযশ, খ্যাতি প্রতিপত্তির পসার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আমার গৃহিণীর পীড়ার সময় পাশ্চাত্যদেশাগত সেই চাকচিক্য সম্ভার অশোকের দ্বারা শোক নিবারণের চেষ্টা করিতেছি। উন্নতির অন্তরায় আর কাহাকে বলে?

আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা জীবনে যে সব কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহার ক্রমিক ঔষধ প্রয়োগ, বা কোন্ ঔষধে কি পরিমাণে কি কি ক্ষেত্রে কি উপসর্গে ফললাভ করিলেন, বা বিফল হইলেন তাহা অন্য যে কাহাকেও জানিতে দেন না বরং যাহাতে অন্যে না জানিতে পারে, তজ্জন্য যথাসম্ভব "গঙ্গাধর চূর্ণকে. চন্দ্রচূড় চূর্ণ

নাম দিয়া বা চন্দ্রপ্রভা'কে সুধাংশু বটী ইত্যাদি করিয়া সাধারণ চিকিৎসকগণ যাহাতে ভ্রমে পড়েন তাহার জন্য চেষ্টা করেন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ইহাই উন্নতির অন্তরায়।

কোন মহাত্মা হয়ত আমাতীসার রোগে, জরাধিকারের একটী ঔষধে সুফল প্রাপ্ত হইলেন কিন্তু তিনি রোগীর নিকট ব্যবস্থা-পত্রে যে নাম লিখিলেন সেটী আমাতীসারেরই ঔষধ। কেননা অন্য চিকিৎসক দেখিলে কি বলিবেন এই ভয় এবং দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীবিলাসে যে অতিসার আরোগ্য করিলেন ইহা অপরকে কেন শিখাইবেন, বরং যাহাতে লক্ষ্মীবিলাসের যে অতিসার নাশক ক্রিয়া আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, সেটি যাহাতে অন্যে শিক্ষা প্রাপ্ত না হয় বা জানিতে না পারে তজন্য শাস্ত্র-বাক্যকে প্রলোভন বাক্য বা মিথ্যা ফলশ্রুতি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতেই বলি ইহাই আমাদের উন্নতির অন্তরায়। প্রত্যেক চিকিৎসকগণ যদি ঔষধের ক্রিয়ার সাফল্যলাভ করিয়া চিকিৎসা জগতে ব্যক্ত করেন তাহা হইলেই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার এই জন্যই এত উন্নতি। যদি এই সমস্ত কারণ কূট দূর হইয়া, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বাঙ্গ শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে শল্য, শালাক্য প্রভৃতি চিকিৎসার আমরা অনুরাগী হইতে পারি তবেই আবার আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি সম্ভবপর হইবে।

তবে সুখের বিষয় সংপ্রতি এই অন্তরায় অন্তর্হিতের পথও সুগম হইতেছে। যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার, অগ্নিপ্রয়োগ, জলৌকা নিয়োগ, পঞ্চকর্ম্ম দ্বারা জরা ব্যাধিনাশের উপায়, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সমন্বয়ে ঔষধের বীর্য্য রক্ষা প্রভৃতির সহজে শিক্ষার উপায় হইয়াছে। কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় তাহার আদর্শ। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আর্য্য গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিতে, আর্ষবাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে, এই শুভক্ষণে, শুভ কার্য্যে সহরবাসী, মফস্বলবাসী মহিমান্বিত চিকিৎসক মহোদয়গণের সার্ব্বাঙ্গীন সহানুভূতি আবশ্যক। সমগ্র দেশবাসী, ভারতবাসী একনিষ্ঠ হইয়া এই পৈতৃক সম্পত্তি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি কামনায় কায়মনো-বাক্য দ্বারা ত বটেই কিছু কিছু যথাসাধ্য অর্থ দ্বারাও এই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়কে চিরস্থায়ী যদি করিবার চেষ্টা করেন, তবেই ভারতে পুনর্ব্বার শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ বিভূষিত চিকিৎসকগণ আবির্ভূত হইয়া উন্নতির অন্তরায়কে দূরীভূত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু শুধু এই বিদ্যালয়ের উপরও নির্ভর করিলে চলিবে না। ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের আদর্শে মফঃস্বলেও যাহাতে শিক্ষালাভ হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এ আশাও হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে হইবে। এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য যদি ভারতবাসীর মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অর্থসাহায্য করা আবশ্যক হয়, তাহাও করিতে হইবে। রাজদ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনায় কাতরকণ্ঠে রোদন করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠ ভাবে বিদ্যালয়ের সেবা করিতে হইবে, তবেই এই বিদ্যালয়টীর অঙ্গ বৈকল্য দোষ অপগত হইয়া দৃঢ়পদে দাঁড়াইতে